শিবব্রত বর্মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানিয়া লুলু | শিবব্রত বর্মন

বিজ্ঞান-কল্পকাহিনির চেনা সীমানা ডিঙিয়ে
এই গল্পগুলোতে বিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসির
এমন এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে
যা পাঠককে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে রাখবে।

Banialulu
A collection of
science fiction stories
by Shibabrata Barman

Cover design
Sabyasachi Mistri
Price : Taka 240 only
facebook.com/baatigharpub

A Baatighar
publication

9 789848 034125

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন এক দেশ, মানচিত্রে কোথাও যার উল্লেখ নেই, চরাচরব্যাপী এক ষড়যন্ত্র দেশটির অস্তিত্ব মুছে দিয়েছে, কিন্তু দেশটি যে আছে, মাঝে-মধ্যে পরোক্ষ আভাস পাওয়া যায়; এমন এক জনপ্রিয় লেখক, যার বসবাস অন্য আরেক লেখকের মগজের ভেতরে; এমন এক আপেল, যা আসলে আপেল নয়—শেক্সপিয়রের সনেট; এমন এক তৈলচিত্র, যা যৌথভাবে আঁকছেন দুই সমান্তরাল মহাবিশ্বে বসবাসকারী দুজন শিল্পী; এমন এক কবিতা যা লেখার আগেই চুরি হয়ে গেছে; এমন এক খুনি, যাকে ধরতে হলে প্রমাণ করতে হবে লোকটা রোবটের ওপর নির্যাতন চালাত।

বানিয়ালুলু গল্পগ্রন্থে শিবব্রত বর্মন বিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসির এমন এক কল্পলোক তৈরি করেছেন যা পাঠককে একই সঙ্গে আবিষ্ট করে রাখে অনুসন্ধিৎসায় ও সন্তরণমগ্নতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র সুদীপ্ত সালাম

শিবব্রত বর্মন

জন্ম ১৯৭৩, ডোমার, নীলফামারী।

বিচিত্র বিষয়ে লেখালেখি করলেও প্রধান ঝোঁক গল্প-উপন্যাসে।

প্রথম বই *ছায়াহীন* বেরিয়েছিল ২০০৯ সালে।

বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি ও রহস্যকাহিনি লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানিয়ালুলু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান কল্পগল্প

বানিয়ালুলু

শিবব্রত বর্মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানিয়ালুলু
শিবব্রত বর্মন

স্বত্ব লেখক

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী মিস্ত্রী

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪২৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক : বাতিঘর
প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম

বাতিঘর ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর
বাতিঘর সিলেট : গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স, ৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার

মুদ্রণ : পূর্বা, ৩৫ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ২৪০ টাকা

Banialulu
(A collection of science fiction stories)
by Shibabrata Barman

Published by Baatighar
Press Club Bhaban, Jamal Khan Road, Chattogram, Bangladesh
e-mail: baatighar.pub@gmail.com, Web: www.baatighar.com
Phone: 031 2869391, 01733067005

Price Taka 240 only

ISBN: 978-984-8034-12-5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলতাফ শাহনেওয়াজ
আবুল বাসার

যাদের শ্রম ও ঘামের
ফসল এই বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

It is not down in any map;
true places never are.

Moby Dick
Herman Melville

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানিয়ালুলু ১১
জাগার বেলা হলো ২০
দুই শিল্পী ৩৫
ভেতরে আসতে পারি? ৪২
প্রতিদ্বন্দ্বী ৫১
দ্বিখণ্ডিত ৬০
ড. মারড্রুসের বাগান ৭১
বহুযুগের ওপার হতে ৮১
সার্কাডিয়ান ছন্দ ৯২
বুলগাশেম প্যারাডক্স ১০২
মইদুল ইসলামের শেষ তিন উপন্যাস ১১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানিয়ালুলু

বানিয়ালুলু নামে যে একটা দেশ আছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় না এলে এটা কারও জানাই হতো না। জানা হতো না, লুলু নামে বানিয়ালুলুর একটা দাপ্তরিক ভাষা আছে এবং সোয়া কোটি লোক সেই ভাষায় কথা বলে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে গিয়ে এই দেশটির অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে। কীভাবে সেটা ঘটল, সেই কাহিনি একাধারে কৌতুকময়, চমকপ্রদ এবং কিছুটা শ্বাসরুদ্ধকরও বটে, কেননা এর সঙ্গে একজনের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার যোগ আছে। যিনি নিখোঁজ হয়েছেন, তিনি একজন সাংবাদিক। তাঁর কথা আমি যথাস্থানে বলব। এখন শুরুর কথা শুরুতে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাতটি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেন। এই সাতটি দেশ হলো ইরান, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন, সোমালিয়া, শাদ এবং উত্তর কোরিয়া। এই নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী। দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে এটি স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে জারি করা হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এটি ছিল ওই দিন একই বিষয়ে জারি করা দ্বিতীয় আদেশ। এর আধা ঘণ্টা আগে দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে যে আদেশটি জারি করা হয়েছিল, তাতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ছিল আটটি দেশের নাম। অস্বাভাবিক দ্রুততায় সেই আদেশ বাতিল করে দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আদেশ জারি করা হয়। সেখানে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সাতটি দেশের নাম দেখা যাচ্ছে। যে অষ্টম দেশটির নাম কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেটি বানিয়ালুলু। এই দেশটির নাম আগে কেউ কখনো শোনেনি। এই নামে কোনো দেশ নেই।

হোয়াইট হাউসের অফিশিয়াল ঘোষণায় কী করে অস্তিত্বহীন একটি দেশের নাম এল, তা নিয়ে কেউ খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। অনেকেই এটাকে দাপ্তরিক প্রমাদ হিসেবে ধরে নেয়। তা ছাড়া সাত দেশের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যে হই-হাঙ্গামা শুরু হয়, সবার নজর সেদিকে সরে গিয়েছিল। প্রশাসনের কর্মকর্তারা এতে হাঁপ ছেড়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন হোয়াইট হাউসের আসন্ন বহু কেলেঙ্কারির মধ্যে অন্তত একটি আপাতত চাপা দেওয়া গেছে। তাদের এই ভাবনা যে ভুল ছিল, বড়দিন আসার আগেই সেটা টের পাওয়া গেছে।

এখন আমি আমাদের সেই সাংবাদিক বন্ধুর কথা বলব, ২৪ সেপ্টেম্বরের প্রথম ঘোষণাটির দিকে যিনি ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ছিলেন এবং দ্বিতীয় ঘোষণা আসা সত্ত্বেও যাঁর কোঁচকানো ভ্রু সোজা হয়নি। তিনি এর মধ্যে ইঁদুর মরার গন্ধ পেয়েছিলেন এবং সেই গন্ধ তাঁর নাকে ক্রমাগত ঘনীভূত হয়েছে। একাধিক সূত্র তাঁকে নিশ্চিত করেছে, ২৪ সেপ্টেম্বর প্রথম ঘোষণার কেলেঙ্কারির পরপর ওই দিন দুপুরেই হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের অতি আস্থাভাজন 'ইনার সার্কেল' তাৎক্ষণিক জরুরি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসে এবং ওই দিন সন্ধ্যার আগেই কয়েকটি দপ্তরের পাঁচজন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। পুরো বিষয়টির মধ্যে একটি অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো ছিল এবং সবকিছুর ওপর গোপনীয়তার একটা চাদর টেনে দেওয়া হয়েছিল।

চাকরি হারানো পাঁচ কর্মকর্তার একজন ছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড শাখার আর্কাইভিস্ট। কয়েক সপ্তাহ পর অক্টোবরের কোনো এক বিকেলে ম্যানহাটানের নবম ও দশম ব্লকের মাঝে ডেমি জোন্স নামে একটি ক্যাফেতে তাঁকে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে দেখা গেছে। তাঁর সামনে বসে ছিলেন বাতিকগ্রস্ত সেই সাংবাদিক। তাঁকে এখন থেকে আমরা র‍্যাট স্মেলার নামে ডাকব। আর্কাইভিস্ট ও র‍্যাট স্মেলার পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট সেখানে বসে ছিলেন। তাঁরা নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। কথা শেষে বিল মিটিয়ে তাঁরা ট্যাক্সি নিয়ে দুজন দুদিকে চলে যান।

শোনা যায়, র‍্যাট স্মেলার তাঁর দেড় কক্ষের ক্ষুদ্র অ্যাপার্টমেন্টে পাঁচ হাজার শব্দের একটি প্রতিবেদন তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়েছিলেন। বেশ কিছু দলিলপত্রও জোগাড় করে ফেলেছিলেন তিনি। প্রতিবেদনের প্রস্তাবিত শিরোনাম তিনি দিয়েছিলেন 'বানিয়ালুলু একটি দেশের নাম'। আটলান্টিকের অপর পারে একটি ইংরেজি ট্যাবলয়েডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল বলেও জানা যায়, তবে কেউ নিশ্চিত নন, নির্মীয়মাণ প্রতিবেদনের কোনো অসম্পূর্ণ খসড়া তিনি সেই পত্রিকার অফিসে পাঠিয়েছিলেন কি না। তত দিনে তাঁর প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নানাভাবে প্রচার পেতে শুরু করেছে এবং তিনি কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন, একটা পর্যায় পর্যন্ত সেটা জানাজানি হয়ে গেছে।

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে র‍্যাট স্মেলার নিখোঁজ হন। অনেকে বলেন, তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই অন্তর্ধানের যোগ আছে। থাকাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

র‍্যাট স্মেলার একটি বিস্ফোরক তথ্য প্রচারে নেমেছিলেন। তাঁর দাবি, ট্রাম্পের প্রথম ঘোষণায় কোনো দাপ্তরিক প্রমাদ ছিল না। বানিয়ালুলু নামে একটি দেশের অস্তিত্ব সত্যি আছে। বেলজিয়াম বা দক্ষিণ আফ্রিকা বা প্যারাগুয়ে নামক দেশগুলো যেভাবে অস্তিত্বশীল, বানিয়ালুলুর অস্তিত্ব তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তফাতের মধ্যে জাতিসংঘের সদস্য দেশের তালিকায় এটির নাম নেই, পৃথিবীর কোনো মানচিত্রে এটির উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং কোনো ভূগোলের বইতেও এর সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেট ডিপার্টমেন্টের ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্টের গোপন কুঠুরি থেকে র‍্যাট স্মেলার যেসব দালিলিক তথ্য-উপাত্ত হাত করেছেন, সেগুলোর ভিত্তিতে বানিয়ালুলুর কিছু বিবরণ দাঁড় করানো সম্ভব। তবে স্বীকার না করে উপায় নেই, সেই বিবরণ বড়ই ছেঁড়াছেঁড়া, অসম্পূর্ণ এবং জোড়াতালিময়। এগুলো দেশটি সম্পর্কে কোনো অখণ্ড, সঙ্গতিপূর্ণ ছবি হাজির করে না। যেমন ধরা যাক, আমরা বানিয়ালুলুর রাজধানী শহরের নাম পাই না, অথচ রাজধানীর পূর্ব প্রান্তে ইমাহাতি নামে যে একটি মহল্লা আছে এবং সেই মহল্লার ৩৩৬ ও ৩৩৭ নম্বর বৈদ্যুতিক খুঁটির মধ্যবর্তী দূরত্ব যে ১৬ গজ—এই অপ্রয়োজনীয় তথ্য আমরা জানতে পারি। দেশটির দাপ্তরিক ভাষা লুলুর নিজস্ব লিপি নেই, এই তথ্য একাধিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা জানতে পারি না, কোন ধার করা লিপিতে তা লেখা হচ্ছে। এক স্থানে খুবই পরোক্ষ একটি উল্লেখে বলা হয়েছে, নেপোলিয়নের অস্টারলিৎসের যুদ্ধ জয়ের সময়কাল থেকে লুলু ভাষা মান্দারিন লিপিতে লেখা হয়ে আসছে। কিন্তু এ থেকে অনুমান করার কোনো কারণ নেই যে দেশটির সঙ্গে চীনা ভাষাভাষি অঞ্চলের কোনো ভৌগোলিক যোগ আছে।

বানিয়ালুলু সম্পর্কে কিছু বিবরণে শুধু যে সঙ্গতির অভাব প্রকট—তা-ই নয়, কিছু বিবরণ পরস্পরবিরোধীও বটে। যেমন ধরা যাক, কয়েকটি উল্লেখ থেকে মনে হতে পারে, দেশটি সিরিয়া এবং আজারবাইজানের মাঝামাঝি কোনো মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। আবার অপর একটি উল্লেখে মনে হবে, দেশটি বাল্টিক সাগর তীরবর্তী। অথচ নামের ধ্বনিবিন্যাসের কারণে অনেকের অনুমান, বানিয়ালুলুর অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের কোথাও। অনেকে লাতিন আমেরিকাকেও সন্দেহে রাখতে পারেন। তবে অবস্থান নিয়ে যত ধোঁয়াশাই থাক না কেন, দুটি বিষয় সন্দেহের ঊর্ধ্বে। প্রথমত, বানিয়ালুলু কোনো দ্বীপ দেশ নয়। এটির অবস্থান পৃথিবীর বৃহৎ মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলোর কোনো একটিতে। দ্বিতীয়ত, দেশটি বিষুবীয় অঞ্চলের দেশ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র‍্যাট স্মেলার বানিয়ালুলুর ভূ-প্রকৃতি, কৃষি, জলবায়ু এবং মানুষের জীবনযাত্রা-সংক্রান্ত যেসব দলিল জোগাড় করেছেন, আমি বলব, সেগুলো বরং অনেক বেশি সুসঙ্গত এবং বিশদ। কিছু বিবরণ রেমব্রান্টের ছবির মতো জীবন্ত। একটি বিবরণে আদ্দিশ নামে একটি পাহাড়ের পাদদেশে সাত সদস্যের একটি পরিবারের এক দিনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা আছে। পরিবারের একটি মেয়ে পাতকুয়া থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলছে। এমনকি সেই বালতির প্রতিটি রিভেটের গায়ে হলদেটে মরচের বিবরণও আমরা পাই। পরিবারটির বসতভিটা থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে গেছে একটি নদী, যার নাম যদিও উল্লেখ করা নেই, তবে সেই নদীর স্বচ্ছ জলের তলদেশে খেলা করা প্রতিটি মাছের নামধামসহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া আছে। সেই বিবরণ এত নিখুঁত যে মাছের প্রতিটি আঁশ থেকে ছুটে আসা রোদের ঝিলিক চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

র‍্যাট স্মেলার বানিয়ালুলুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় বর্ষের বোটানি বইয়ের (রুশ ভাষায় ভাষান্তরিত) পঞ্চম অধ্যায়ের পুরোটাই হাতে পেয়েছেন। সেখানে বানিয়ালুলুর ছয় ধরনের বায়ুপরাগী ফুলের প্রস্থচ্ছেদের ছবি দেওয়া আছে। পাঁচটি ফুল অতি পরিচিত। ষষ্ঠ ফুলটি আমাদের জবা ফুলের মতো দেখতে হলেও একটু ভালো করে তাকালে পাপড়ির বিন্যাসের অমিলগুলো চোখে পড়বে।

ষাটের দশকে দেশটিতে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল বলে একটি দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোথাও বলা হয়নি, বানিয়ালুলুর প্রধান ফসল কী। ভুট্টাজাতীয় একটি ফসলের উল্লেখ এক স্থানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে যেতে চাইলে তা হবে অতি সাধারণীকরণ।

র‍্যাট স্মেলার দেশটির গ্রামাঞ্চলে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের দীর্ঘ ক্লান্তিকর বিবরণ দিয়েছেন। তা থেকে সেখানকার লোকাচার, পোশাক এবং খাদ্যাভাস সম্পর্কে অনেক ধারণা পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি যে চারটি বিয়ের গীতের লিরিক তুলে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে প্রচলিত লোকবিশ্বাস এবং অধিবাসীদের যৌথ মনোজগৎ সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় অনুমান করা যায়। শেয়াল আর কাকের চালাকি নিয়ে কয়েকটি উপদেশমূলক গল্পের একটি সিরিজ এ ক্ষেত্রে সোনার খনি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এগুলো থেকে সহজে অনুমেয়, সেখানকার কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলোয় এখনো কৌম সমাজকাঠামোর প্রভাব প্রবল এবং শহরাঞ্চলে অর্থবিত্তের চেয়ে দৈহিক শক্তি এবং বংশপরিচয়কে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়।

র‍্যাট স্মেলার দেশটির মুদ্রা এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সামান্য কিছু বিবরণ হাজির করতে পেরেছেন। এ ছাড়া দেশটির শিল্প অঞ্চলে অবস্থিত একটি কারাগারের পঞ্চাশজন কয়েদির অপরাধের বিবরণ থেকে সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা এবং এমনকি আর্থসামাজিক কাঠামো সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

মোটকথা র‍্যাট স্মেলার যেসব বিচ্ছিন্ন দলিল ও বিবরণ উদ্ধার করেছেন, সেগুলো জোড়া লাগিয়ে বানিয়ালুলুর একটি ছবি দাঁড় করানো যায় বটে, তবে সেই ছবি একটা পুরোনো বিবর্ণ পারিবারিক অ্যালবামের ফাংগাস আক্রান্ত গ্রুপ ছবির মতোই ধোঁয়াশাময়। তাতে প্রকাশিত অংশের চেয়ে অপ্রকাশিত অংশই বেশি।

র‍্যাট স্মেলারের প্রতিবেদনের সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো, সমগ্র বিশ্বের কাছে বানিয়ালুলুর অস্তিত্ব কী করে এত দিন গোপন রাখা সম্ভব হলো আর এ নিয়ে এত ঢাকঢাক-গুড়গুড়ের কারণ কী—এগুলোর কোনো ব্যাখা এতে নেই। এ নিয়ে কোনো ইঙ্গিত বা অনুমানের সূক্ষ্ম সূত্রও হাজির করতে পারেননি তিনি। আমার মনে হয়েছে, গোপনীয়তার এই রহস্য ভেদের চেয়ে দেশটির বিবরণ দেওয়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল।

এই সব বিবরণ থেকে কতগুলো সাধারণ জিনিস যৌক্তিকভাবে প্রতিপন্ন হয়। প্রথমত, বানিয়ালুলু কোনো বিচ্ছিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ নয়। মান্দারিন লিপি গ্রহণ, রুশ ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বইপত্রের উপস্থিতি এবং সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকায় (ভুলবশত) উল্লেখ প্রমাণ করছে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে এটির যোগাযোগ আর দশটা দেশের মতোই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘটছে। র‍্যাট স্মেলার এমনকি তুরস্কের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বানিয়ালুলু সফর এবং দেশটি থেকে গ্রানাইট পাথর আমদানিসংক্রান্ত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের কথা উল্লেখ করেছেন।

এরপরও বানিয়ালুলুর অদৃশ্য থেকে যাওয়ার বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় রহস্যগুলোর একটি। অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে এই বিষয়টিতেই র‍্যাট স্মেলারের বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নিজে এ বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধান করে অবশেষে বুঝতে পেরেছি, এ ক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রগতির সুযোগ নেই। বানিয়ালুলুর অনস্তিত্ব কোনো অভিপ্রায়হীন নিরীহ ঘটনা নয়। এর পেছনে চরাচরব্যাপী ষড়যন্ত্রের সুদীর্ঘ জাল বিছানো। সেই জাল ভেদ করা শুধু যে অসম্ভব, তা-ই নয়, তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণও। আমরা বড়জোর ষড়যন্ত্রটির প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু আঁচ-অনুমান করতে পারি।

বানিয়ালুলুর অনস্তিত্বের দুটি লক্ষণীয় দিক আছে। প্রথম কথা হলো, এটির উপস্থিতি বিশ্বের যৌথ মানব অনুধাবন থেকে এমন বিশেষ কায়দায় মুছে ফেলা হয়েছে, যেন ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই এটির অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ অবলোপন প্রক্রিয়াটির একটি রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট বিদ্যমান। এটা অর্জন প্রায় অসম্ভব একটি বিষয়। দ্বিতীয়ত, বানিয়ালুলুর অস্তিত্ব অবলোপনের সঙ্গে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যোগ আছে। এই অবলোপন প্রক্রিয়াটির সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি অংশজুড়ে বিস্তৃত একটি সুবিশাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার টিকে থাকা না-থাকার প্রশ্ন জড়িত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলোপন প্রক্রিয়াটি কীভাবে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে আমার একটি অনুমান বা হাইপোথিসিস আছে। অনুমানটি আমার মধ্যে বিদ্যুজ্জলকের মতো উঁকি দিয়েছে, যখন আমি দক্ষিণ আমেরিকায় হিস্পানি উপনিবেশ বিস্তার প্রক্রিয়া নিয়ে পোস্ট-কলোনিয়ান ইতিহাসবিদ টমাস মানরোর একটি বই পড়ছিলাম। মানরো দেখিয়েছেন, কী করে হিস্পানি কনকিস্তাদোররা একটি বিশাল অ্যাজটেক মন্দির ফিজিকালি ধ্বংস না করে সেটার অস্তিত্ব মুছে দিতে পেরেছিল। পিরামিড আকৃতির এই মন্দিরটির দেড় হাজার সিঁড়ির ধাপের একটি পাথরও না সরিয়ে, একটি মূর্তিও অপসারণ না করে মন্দিরটি এমনভাবে গায়েব করা হয়েছে, কোথাও কোনোভাবে এটি আর দেখতে পাওয়া যায় না, দেখতে পাওয়া যাবে না। যে অভিনব কায়দায় এ কাজটি করা হয়েছে, টমাস মানরো সেটার নাম দিয়েছেন 'কালচারাল ডিজইন্টিগ্রেশন'। মন্দিরসংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, সমস্ত উপাত্ত টুকরো টুকরো করে এমন বিশেষ কায়দায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য তথ্যের সঙ্গে তা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এগুলো সমন্বিত করে মন্দিরসংক্রান্ত কোনো অভিন্ন অনুধাবন কারও পক্ষে গড়ে তোলা আর সম্ভব নয়। ফলে কারও অনুধাবনে মন্দিরটি একটি প্রাচীন বৃক্ষ, কারও অনুধাবনে এটি একটি প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিকক্ষের ব্ল্যাকবোর্ড, আবার অনেকের অনুধাবনে এটি একটি লন্ড্রির দোকান হিসেবে প্রতিভাত হয়।

হতে পারে বানিয়ালুলুর ক্ষেত্রে এ রকম নিখুঁত রেট্রো এফেক্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে ওই একই কালচারাল ডিজইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে মানতে হবে, বানিয়ালুলুকে ফিরিয়ে আনার আর কোনো সুযোগ নেই। দেশটি চিরতরে হারিয়ে গেছে। আমরা বড়জোর মার্কিন সাংস্কৃতিক প্রক্ষেপগুলোর মধ্যে বানিয়ালুলুর ডিজইন্টিগ্রেটেড অস্তিত্বের পরোক্ষ কিছু আভাস খুঁজতে পারি মাত্র। এ জন্যে আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে প্রখর ও শাণিত করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসন্ধানী চোখে তাকাতে হবে হলিউডের স্টুডিওগুলো থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর কাহিনি ও সংলাপের দিকে, কান পাততে হবে রক-অ্যান্ড-রোলের প্রতিটি ড্রাম বিটের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র অবকাশবিন্দুতে, বার্নস অ্যান্ড নবলের প্রত্যেক তলার প্রতিটি নিউ অ্যারাইভালের প্রতিটি পাতার দুটি লাইনের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলোর বিন্যাস লক্ষ করতে হবে এবং এমনকি নিউইয়র্কের প্রতিটি সড়কের ফুটপাতে প্রতিটি ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দেওয়া কফির মগ লক্ষ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা বানিয়ালুলুর খুবই পরোক্ষ উল্লেখের কোনো কোনো আণুবীক্ষণিক টুকরো হয়তো মাঝে মাঝে শনাক্ত করতে সক্ষম হব।

র‍্যাট স্মেলারের প্রসঙ্গ দিয়ে শেষ করি। অনেকে তাঁর অনুপস্থিতিকে জবরদস্তিমূলক অন্তর্ধানের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেন। তবে আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আরও দুটি সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করে দেওয়া যাবে না। বানিয়ালুলুর বিবরণ সরবরাহ করতে গিয়ে দেশটির ব্যাপারে র‍্যাট স্মেলারের ক্রমবর্ধমান মুগ্ধতা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। হতে পারে, দেশটিতে পাড়ি জমানোর কোনো গোপন সুড়ঙ্গ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। অথবা তিনি আদৌ নিখোঁজই হননি। অজস্র তথ্য আর উল্লেখের মধ্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে তিনি হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন ম্যানহাটানেরই রাস্তায় রাস্তায়, আমাদের পাশে পাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগার বেলা হলো

'আমি এখন আর কোনো স্বপ্ন দেখি না,' লোকটা বলল। এমনভাবে বলল, যেন অভূতপূর্ব কোনো কথা শোনাচ্ছে।

কথাটা বলে একটু দম নিল লোকটা। গভীর আর্তিভরা চোখে তাকাল আমার দিকে। আমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়।

আমার কোনো ভাবান্তর হলো না। বললাম, 'এ যুগে স্বপ্ন দেখা কঠিন। আমাদের কোনো স্বপ্নই তো আর অবশিষ্ট নেই।' বলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম।

লোকটা আমাকে হতাশ করেছে। আমি আরও চমকপ্রদ কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। খুব গুপ্ত, গূঢ় কোনো কথা। এমন কিছু, যা শুনে আমার ভ্রু কুঁচকে যাবে। কৌতূহল জাগবে। অন্তত আমার সামনে বসার পর লোকটা শুরুতে এ রকমই তো আভাস দিয়েছিল। বলেছিল, অত্যন্ত জটিল আর বিস্ময়কর একটা সমস্যা নিয়ে সে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু এখন দেখছি, সে অযুত-সহস্র হতাশাগ্রস্ত মধ্যবয়সীদের একজন। আমিও সে কারণেই তাকে একটা বাজারচলতি কিন্তু অর্থহীন সান্ত্বনাবাক্য বললাম।

'আমি কিন্তু সে কথা বলিনি। স্বপ্ন দেখি না বলতে আমি বোঝাচ্ছি, আমি কোনো স্বপ্ন দেখি না। ঘুমের মধ্যে আমি কোনো স্বপ্ন দেখি না।'

'স্বপ্ন দেখেন। ঘুম ভেঙে মনে থাকে না যে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি স্বপ্ন দেখি না,' লোকটা জোর দিয়ে বলল। খুব জেদি আর গোঁয়ার ভঙ্গি তার গলায়।

'সেই অর্থে আমরা কিন্তু কেউই স্বপ্ন দেখি না। ঘুম ভাঙার পর স্বপ্ন দেখার একটা ধোঁয়াটে স্মৃতি কেবল থাকে আমাদের। মানে বলতে চাচ্ছি, স্বপ্ন দেখাটা আসলে স্বপ্ন দেখার একটা স্মৃতিমাত্র, একটা অসম্পূর্ণ ক্ষয়িষ্ণু অপভ্রংশ স্মৃতি।'

আমি খুব দার্শনিক ভঙ্গি করে কথাটা বললাম। লক্ষ রাখলাম, বলার সময় যাতে আমার জ্ঞান আর প্রজ্ঞার ওজন প্রকাশ পায়।

লোকটা একটু বিরক্ত গলায় বলে, 'আমি স্বপ্ন দেখি না, কেননা আমি ঘুমাই না।'

'ও, আপনি তাহলে স্লিপ ডিজঅর্ডার নিয়ে এসেছেন! প্যারাসমনিয়া!'

'হতে পারে। আমি তো আর এসব শব্দ জানি না।'

'কবে থেকে এই সমস্যা?'

'দুই বছর।'

'মানে কি দুই বছর ধরে আপনি ঘুমান না?'

লোকটা মাথা নাড়ে। সে এবার একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে।

'আপনি শব্দটা কী বললেন যেন, প্যারাসমনিয়া?'

'হুম।'

'আমি ইনসমনিয়া শব্দটা শুনেছি। এটা শুনিনি।'

'শব্দ জানা জরুরি নয়। আপনি দুই বছর ধরে ঘুমান না?'

'হ্যাঁ।'

'সর্বনাশ। আপনি মারা যাবেন তো!'

লোকটা চুপ করে থাকে।

'সমস্যা হয় না? ক্লান্তি?'

'না, হয় না।'

'হওয়ার কথা। ঘুমের ঘাটতি হলে প্রি-ফ্রন্টাল করটেক্স আর টেমপোরাল লোব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এগুলো মগজের কতগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকা। তখন যুক্তিশৃঙ্খল এলোমেলো হয়ে যায়, চিন্তাশক্তি কমে যায়, কথাবার্তাও অসংলগ্ন হয়ে যায়।'

লোকটা মাথা নিচু করে থাকে। যেন বাধ্য ছাত্র, গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া নিচ্ছে।

'আপনি কোনো নিউরোলজিস্টের কাছে গেলে ভালো করবেন। এটা একটা নিউরোলজিক্যাল সমস্যা। আমি একজন সাইকোলজিস্ট। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি আমার বিদ্যা। আমার কারবার মন নিয়ে। আপনি আমার কাছে খামোখা এসেছেন।'

'যাব,' লোকটা অলসভাবে বলে।

মনে হলো, লোকটা এবার উঠবে। উঠুক। আমারও তাড়া আছে। অ্যাসিসট্যান্ট ছেলেটাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। আমিও এখনই উঠব। তার আগে ড্রাইভারকে ফোন দিতে হবে। আমি ঘড়ির দিকে তাকাই।

আমার এই ভঙ্গি দেখে লোকটা উঠে দাঁড়ায়।

আমি বলি, 'আচ্ছা, একটা কথা। আপনি ঘুমের সমস্যা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু শুরুটা করলেন স্বপ্নের কথা বলে। কেন?'

'মানে?'

'মানে আপনি "ঘুমান না" না-বলে বললেন, আপনি "স্বপ্ন দেখেন না"। কেন?'

লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন একটা ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়ে গেছে, এমনভাবে সে আবার বসে পড়ে। এই সেরেছে, রে।

'আমি তো সেই কথাটাই বলতে এসেছি। আপনি প্লিজ মনোযোগ দিয়ে আমার কথাটা শুনুন। প্লিজ।'

'শুনব। কথা শোনাই আমাদের কাজ। কিন্তু আপনি কি সংক্ষেপে বলতে পারবেন? মানে আমার একটু তাড়া আছে।'

'আমি খুবই সংক্ষেপে বলব। আপনি প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।'

লোকটা নড়েচড়ে বসে। আমি তার মধ্যে কোনো তাড়া দেখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। এ লোক সংক্ষেপে বলবে না।

'আপনি একটু আগে বললেন না নিউরোলজিস্টের কাছে যেতে?'

'বলেছি।'

'ইনফ্যাক্ট ঢাকা শহরে এমন কোনো নিউরোলজিস্ট নেই, আমি যার কাছে যাইনি। গত দুই বছর ধরে এমন কোনো ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা নেই, আমাকে করানো হয়নি। কিছুই ধরা পড়েনি। কত রকম যে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে! কোনো লাভ হয়নি।'

আমি চুপ করে থাকি।

'আমি নিজে অনেক চিন্তা করেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি, সমস্যাটা কোথায়। অনেক ভেবে...অনেক ভেবে...বুঝেছেন... অনেক চিন্তাভাবনা করে অবশেষে আমি বের করে ফেলেছি, কেন আমার ঘুম হয় না।'

এটুকু বলে লোকটা থামে। থেমেই থাকে।

লোকটা আমার কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন আশা করছে।

আমি বলি, 'তা, কেন ঘুম হয় না?'

লোকটা সামনে ঝুঁকে আসে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। ভারি নিশ্বাস পড়ছে। অত্যন্ত নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে লোকটা বলে, 'আমার ঘুম হয় না, কারণ আমি আসলে ঘুমিয়ে আছি।'

বলেই লোকটা সোজা হয়ে বসে। পায়ের ভর পরিবর্তন করে। বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে।

আমি কিছু বলি না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি ঘড়ির ডায়ালের দিকে। সেকেন্ডের কাঁটাটা টিকটিক করে এগোচ্ছে।

'আপনি কি কাল আবার আসতে পারবেন?'

'আমি আর সামান্য কয়েকটা মিনিট সময় নেব। প্লিজ, আমাকে পুরোটা বলতে দিন।'

'বলুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি অনেক ভেবে দেখলাম, যে লোক ঘুমিয়ে আছে, সে আর ঘুমাবে কী করে! তার পক্ষে তো আর ঘুমানো সম্ভব নয়।'

'ঠিক কথা। তাহলে আপনি ঘুমিয়ে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'ঘুমিয়ে কথা বলছি না। আমি আসলে কথাই বলছি না। আমি স্বপ্ন দেখছি।'

'দুর্দান্ত বলেছেন! আপনি স্বপ্নে দেখছেন যে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আমি আসলে একটা দীর্ঘ স্বপ্নের ভেতর আছি।'

'আর এ কারণেই আপনি কোনো স্বপ্ন দেখেন না?'

'ইয়েস।'

'দারুণ! দারুণ!' আমি এবার ঘর কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠি।

আমার এই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া দেখে লোকটা অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বসে থাকে।

'আপনি স্বপ্নে দেখছেন যে আপনি এই মুহূর্তে এই ঘরে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছেন?'

লোকটা চুপ করে থাকে।

'তার মানে এই ঘরটা, এই যে টেবিল, এই যে ফুলদানি, ওই যে জানালা, জানালার পর্দা...দেয়ালে ক্যালেন্ডার, ক্যালেন্ডারের পাশে টিকটিকি...এগুলো...এই পুরা জগৎটা আপনার স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে আপনার সামনে এই যে আমি বসে আছি, আমার কোনো অস্তিত্ব নাই? আমিও আপনার স্বপ্ন?'

লোকটা মাথা নিচু করে। যেন আমাকে স্বপ্নে পর্যবসিত করায় সে কিছুটা বিব্রত, লজ্জিত।

আমি বলি, 'হুম। ইন্টারেস্টিং। কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। কিন্তু দয়া করে বলবেন কি, ঠিক কী কারণে আপনার এই কথা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো? মানে আপনি কীভাবে এই সিদ্ধান্তে এলেন?'

'আমি পুরোটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব। আপনি একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন আমার কথা।'

'অবশ্যই শুনব। আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। আপনি সময় নিয়ে বলুন।'

'আমাকে পাগল মনে হচ্ছে আপনার, তাই না?'

'মোটেই না। এক্কেবারে না। আপনি আমার কাছে এসেছেন। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার কথা শুনছি। আপনার প্রতিটি কথা আমি বিবেচনা করছি, আমার মতো করে।'

আমি উঠে গিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। কাচের ওপারে নিচে রাতের শহর। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। স্ট্রিট লাইটের হলুদ আলো কেমন ঝাপসা, ল্যাপটানো। গাড়ির হেডলাইটের আলো পিছলে যাচ্ছে রাস্তার পিচে।

'আপনি কি কিছু খাবেন, চা, কফি?'

'কফি দিতে পারেন।'

আমি কফি বানাই। মগটা তার হাতে দিয়ে আমার চেয়ারে বসি।

'আপনি *ম্যাট্রিক্স* দেখেছেন?'

লোকটা কী যেন ভাবছিল। আমার প্রশ্নে চমক ভাঙে।

'না। কী সেটা?'

'একটা সিনেমা।'

'ওহ।'

আমি আয়েশ করে বসে কফিতে চুমুক দিই, 'এবার বলুন।'

'কী বলব?'

'বলুন, কীভাবে এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে এলেন যে, আপনি আসলে স্বপ্ন দেখছেন, দীর্ঘ একটা স্বপ্ন?'

'বলছি,' লোকটাও আয়েশ করে বসে। 'আমি ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি, ফার্স্ট অফিসার পদে। ছোট পোস্ট। কাজ বেশি। থাকি পলাশীতে স্টাফ কোয়ার্টারে। বছর দুয়েক কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারও বেশি আগের ঘটনা। আমার অফিসে একটা আর্থিক কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যায়। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি। অনেক হইচই। একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এবং সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা, তদন্তে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ নেই আমার। ব্যাপারটা আমার জন্য বিপর্যয়কর। আমি প্রচণ্ড মানসিক শক পাই। আমার শোবার ঘরের ড্রয়ারে দু-পাতা ইনকটিন ছিল।'

'ঘুমের ওষুধ?'

'হুম। আমি চল্লিশটা হাই পাওয়ার্ড ঘুমের বড়ি একসঙ্গে খেয়ে ফেলি।'

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলতে শুরু করে, 'আমি বেঁচে যাই। অচেতন অবস্থায় আমাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওয়াশ-টোয়াশ করানো হয়। সতেরো দিন পর আমার ঘুম ভাঙে। মানে এগুলো পরে জেনেছি আমি। আমাকে বলা হয়েছে।'

'ও, আচ্ছা।'

'বেশ কিছুদিন খুব দুর্বল কাটে। হরলিক্স, ফলমূল খাওয়ানো হয়। ধীরে ধীরে আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাই। অফিসও শুরু করি। কিন্তু অফিসে গিয়ে দেখি, কেউ আর ওই কেলেঙ্কারি বা তদন্তের কথাটা বলে না। আমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। আমি একটু অবাক হই। ভাবি, আমার আত্মহত্যার চেষ্টার কারণে সবাই এখন এগুলো লুকানোর চেষ্টা করছে। খোঁজ নিয়ে শুনি যে এ রকম কোনো তদন্তই নাকি কখনো হয়নি। একটু খটকা লাগে। তবে ভাবি, এটাও আমাকে বিব্রত না করার একটা কৌশলমাত্র। আমি আর এটা নিয়ে ভাবব না বলে ঠিক করি। আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাই। কোথাও কোনো ঘাপলা নেই, কোনো গড়বড় নেই। শুধু একটাই সমস্যা। ইনসমনিয়া। আমার ঘুম হয় না। কিছুতেই না। এক ফোঁটা ঘুম হয় না। ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার প্রথমে বলে, অতিরিক্ত ঘুমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওষুধ খাওয়ার রিঅ্যাকশন। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয় না। আমি সারাক্ষণ জেগে থাকি। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে বারান্দায় পায়চারি করে কাটাই। ঘুম নেই, ঘুমহীনতার কোনো ক্লান্তিও নেই। ফলে খুব বেশি চিন্তিত হই না। সপ্তাহ দুয়েক পরে একটা ঘটনা আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়।'

লোকটা আবারও চুপ করে আমার কাছ থেকে একটা প্রশ্ন আশা করতে থাকে।

'কী সেটা?'

'আমি বাসা থেকে অফিসে যাতায়াত করি পাবলিক বাসে। আমাদের অফিসের একটা পিক-ড্রপ বাস আছে বটে। কিন্তু সেটা আমার রুটে পড়ে না। ফলে আমি পলাশী মোড় থেকে একুশ নম্বর বাসে চড়ি। সেটা মৎস্য ভবনে আমার অফিসের সামনেই আমাকে নামিয়ে দেয়। যে দিনকার ঘটনার কথা বলছি, সেটা ছিল রবিবার। আমি বাসা থেকে বেরিয়ে বাসে উঠেছি। মাঝখানের আইলে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। বাস কোন দিকে যাচ্ছে, বোঝা যায় না। তবে কন্ডাক্টরের ঘোষণা আর বাসের মোচড় নেওয়া গুনে বলে দেওয়া যায়, কখন কোন রাস্তায় আছি। একসময় আমার গন্তব্য চলে আসে। আমি খুব কষ্টে দরজার দিকে এগিয়ে যাই। "স্যার বাম পা আগে ফেইলেন," কন্ডাক্টর সতর্ক করে দেয়। আমি বাম পা আগে ফেলে নামি। কিন্তু নেমেই থ হয়ে যাই। কোথায় মৎস্য ভবন, কোথায় কী! আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। যে বাহনটা থেকে নামলাম, সেটা একটা ট্রেন, সবুজ রঙের বগি। আর সেটা এখনো প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছে। একটা ভোজবাজির মতো আমার চারপাশের জগৎটাকে কেউ বদলে ফেলেছে, বদলে মৎস্য ভবনের জায়গায় একটা রেলস্টেশন বসিয়ে দিয়েছে। আমার পাশ ঘেঁষে লোকজন ট্রেনে উঠছে, নামছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েই থাকলাম। আমার হাতে একটা নীল ট্রাভেল ব্যাগ। আমার পাশে আমার স্ত্রী। সে ভ্রু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। "কী ব্যাপার?" স্ত্রী জিজ্ঞেস করে। আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলি না। যখন ঘোরটা একটু কাটে, তখন জিজ্ঞেস করি, "এটা কোথায়?" স্ত্রী অবাক হয়। "কী ব্যাপার, তোমার কি অসুস্থ লাগছে?" আমি প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসে পড়ি। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, এটা ঢাকা-নাটোর রেললাইনের একটা ছোট্ট স্টেশন, নাম ইদ্রিসপুর। আমরা এসেছি আমাদের এক আত্মীয়ের বিয়ে খেতে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, এখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল। ব্যাপারটা কীভাবে ঘটল, কেন ঘটল—আমি কোনো ব্যাখ্যা পেলাম না।'

'খুব সহজ। মেমোরি লস।'

'আমিও সেটাই ভাবি। মানে, ব্যাপারটা এমন যে রবিবার সকালে আমার অফিসের উদ্দেশে বেরোনো আর সেই অচেনা প্ল্যাটফর্মে নামার মধ্যবর্তী পুরো সময়ের স্মৃতি মুছে গেছে আমার মাথা থেকে। তা-ই তো?'

'হ্যাঁ। তা-ই।'

'মেমোরি লস। ইনসমনিয়ার সাইড-এফেক্ট। সেটাই হওয়ার কথা। আর কীই-বা ব্যাখ্যা হতে পারে। এরপর নিয়মিতই এইসব টুকটাক মেমোরি লসের ঘটনা ঘটতে থাকল। ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর। জানেন, মাঝে মাঝে তো খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে হয়। তবে আমি এই পরিস্থিতির সঙ্গেও মানিয়ে নিতে শুরু করলাম একসময়। চিকিৎসকেরাও সে রকমই পরামর্শ দিল। তবে মুশকিল কী জানেন, ওর মধ্যেও আমি আরেকটা খটকার ব্যাপার খুঁজে পেলাম। যতই মেমোরি লসের ঘটনা ঘটুক, ক্যালেন্ডারের পাতা তো ঠিক থাকবে, তা-ই না? সময় তো একমুখী এগোবে। মানে, প্রতিবার মেমোরি লস করলে আমি নিজেকে ওই সময়ের পরের সময়ে আবিষ্কার করব। মানে ধরুন, রোববার মেমোরি লস করে আমি নিজেকে সোমবার বা মঙ্গলবারে গিয়ে আবিষ্কার করব। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম, সব সময় এটা ঘটছে না। মাঝে মাঝে সময় উল্টো দিকে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে ধরুন, রোববারের পরমুহূর্তে আমি নিজেকে আগের দিন শনিবার বা তার আগের দিন শুক্রবারে আবিষ্কার করছি। এটা হওয়ার কথা না।'

'এগুলোও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ থেকে কোনোভাবেই এমন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় যে....মানে ওই যে, যে-সিদ্ধান্তে আপনি এসেছেন আরকি....

'আমি জানি। এগুলো থেকে কোনোভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কিন্তু আমি সবটা তো বলিনি এখনো। এরপর আমার জীবনে আরও গভীর কিছু জটিলতা দেখা দিতে শুরু করল। এমন কিছু জটিলতা, যেগুলো একেবারে হতবুদ্ধি করে দেয়।'

'যেমন?'

'যেমন ধরুন, মাসুদ এসে একদিন উপস্থিত হলো আমাদের বাসায়।' বলে লোকটা চুপ করে গেল। যেন এটুকু বললেই আমি বুঝে যাব ঘটনার জটিলতা।

'মাসুদ কে?'

'মাসুদ আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমার প্রাইমারি স্কুলের ক্লাসমেট। কলেজ জীবন শেষে সে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। সেখানেই বসবাস করে। মাঝে মাঝে ফোন দেয়।'

'তো মাসুদ এলে সমস্যাটা কী?'

'সমস্যাটা হলো, আমাদের বাসায় এসে উঠল প্রাইমারি স্কুলের মাসুদ। ক্লাস ফোরে পড়া মাসুদ। হাফপ্যান্ট পরা। বয়স নয় কী দশ বছর।'

'মাই গড।'

'সে এসে আমার সঙ্গে থাকছে। আমার সঙ্গে এক টেবিলে খাচ্ছে। গল্পগুজব করছে। যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে অস্ট্রেলিয়ার মাসুদ ফোন করে। চিন্তা করুন দৃশ্যটা। আমি কথা বলছি আমার সমবয়সী ক্লাসমেট মাসুদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। ঠিক সে সময় দশ-বারো বছরের ওই মাসুদই আমার সামনে দুষ্টুমি করছে। এ রকম একের পর এক জটিল সব ঘটনা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনটাকে এলোমেলো করে দিতে শুরু করল। আমি যুক্তিবাদী মানুষ। কিন্তু এগুলোর কোনো মাথামুণ্ডু পাই না।'

আমার কফি শেষ হয়ে গেছে। মগটা নামিয়ে রাখলাম।

'তবু বলব, এ থেকে প্রমাণ হয় না আপনি স্বপ্ন দেখছেন।'

'সারা রাত আলো নিভিয়ে আমি বারান্দায় পায়চারি করি। ওখানে একটা বেতের সোফা আছে। তাতে বসে থাকি। মাঝে মাঝে আমি কান পাতলে কিছু কথোপকথন শুনি। অস্পষ্ট। তবে ভালো করে শুনলে বোঝা যায়। একদল লোক কথা বলছে। আমার মাথার ভেতরেই যেন কথা বলছে তারা।'

'কী বলছে?'

'সব কথা বুঝতে পারি না। দুয়েকটা শব্দ বা বাক্যের খণ্ডাংশ কানে আসে। "ঘুম" "স্বপ্ন"—এই সব শব্দ কানে আসে। মনে হয়, লোকগুলো আমাকে ঘিরে আছে। আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। একদিন একটা লোক আরেকটা লোককে জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে কত দিন ঘুমাবে?' আমি টের পাই...কীভাবে টের পাই—জানি না, তবে টের পাই, এরা কেউ কেউ চিকিৎসক। আমি কোনো হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। এবং ঘুমিয়ে আছি। গভীর ঘুম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নটা পাতলা হয়ে গেলে, মানে ঘুমটা পাতলা হয়ে গেলে আমি চারপাশের সত্যিকার জগতের কিছু শব্দ শুনতে পাই। মানে, ওই যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমি অচেতন হয়ে গিয়েছিলাম, সম্ভবত কোমায় চলে গেছি, এরপর আর ঘুম ভাঙেনি আমার। আমি হাসপাতালে অথবা নিজের বাসার বিছানায় ঘুমিয়ে আছি। এইটাই সবকিছুর একমাত্র ব্যাখ্যা।'

লোকটা দম নেয়। কফির মগ রেখে পেছনে গা এলিয়ে দেয়। একটা দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে সে যেন কিছুটা ক্লান্ত। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি গলা খাঁকারি দিই। চেয়ার থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। নিচে রাতের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। এখনো ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন না। এই জগৎটা ইল্যুশন নয়। খুব সহজ কয়েকটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন।'

লোকটা অপেক্ষা করে।

'অ্যাক্রোম্যাটোপসিয়া।'

'মানে?'

'আপনিই বলুন, কী মানে শব্দটার।'

'আমি জানি না।'

'অ্যাক্রোম্যাটোপসিয়া হলো এক বিশেষ ধরনের কালার ব্লাইন্ডনেস। এটা হলে লোকে কিছু বিশেষ কালার বা রং পারসিভ করতে পারে না।'

'কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক নেই। আমি সেটাই তো বলছি। সম্পর্ক নেই। কথা হলো অ্যাক্রোম্যাটোপসিয়া শব্দটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটা জটিল জারগন। আপনার এই শব্দ জানার কিংবা এর আগে শোনার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না। তাহলে যে স্বপ্ন আপনি দেখছেন, সেই স্বপ্নের ভেতর এই শব্দটা উচ্চারিত হবে না, তাই না? অথচ দেখুন আপনার সামনে এই শব্দটা আমি উচ্চারণ করছি, করেই যাচ্ছি—অ্যাক্রোম্যাটোপসিয়া, অ্যাক্রোম্যাটোপসিয়া, অ্যাক্রোম্যাটোপসিয়া...

আমি তোতাপাখির মতো শব্দটা বলতে থাকি।

লোকটা চুপ করে বসে থাকে।

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন মানেই হলো আমি আপনার স্বপ্নের একটা উপাদানমাত্র। মানে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি এই ঘরে আসার আগে আমার অস্তিত্ব ছিল না। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তাহলে আমার কোনো স্মৃতি থাকার কথা নয়। কিন্তু ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন, গত ৪২ বছরের প্রায় পুরোটা স্মৃতি আমার মনে আছে। আমার এই মোবাইল ফোনে প্রায় সাড়ে চারশ নম্বর সেভ করা আছে। তারা আমার বন্ধু, পরিচিত। আপনি তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারও নাম জানেন না, শোনেননি। আমার স্ত্রী এ মুহূর্তে এখান থেকে দেড় মাইল দূরে একটা সিনেমা হলের সামনে দুটি টিকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আপনি এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র তারা সবাই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না।'

'যাবে,' মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটা একরোখার মতো বলল।

'আচ্ছা, আমি আপনাকে আরেকটা ব্যাখ্যা দিই। খুব সহজ, সাধারণ ব্যাখ্যা। ধরে নিলাম এই জগৎটা আসলে আপনার একটা কল্পনামাত্র, একটা ইল্যুশন, একটা কল্পলোক। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, কী ভীষণ ডিটেইল এই জগৎটা। এখানকার প্রতিটি জিনিস, প্রতিটা বস্তু অসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ। এই যে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। লক্ষ-কোটি বৃষ্টির ফোঁটা আলাদা-আলাদাভাবে পড়ছে, তার প্রতিটি আপনাকে আলাদাভাবে কল্পনা করতে হচ্ছে। সম্ভব? এই জানালার পর্দাটার দিকে তাকান। প্রতিটি সুতা আলাদাভাবে বোনা। সম্ভব?'

লোকটা চুপ করে থাকে।

আমার একটু একটু করে জেদ চাপছে।

'আচ্ছা, চিন্তা করে দেখেছেন, আপনার এই কল্পজগৎ সব সময় পদার্থবিজ্ঞানের সব নিয়ম নিখুঁতভাবে মেনে চলছে। নিউটনের বলবিদ্যা মানছে, থার্মোডাইনামিক্সের সব নিয়ম মানছে, ম্যাক্সওয়েল মানছে, আপনি যেসব নিয়ম-সূত্র এখনো জানেন না, সেগুলোও সবই মানছে। কেন মানছে?'

'জানি না কেন মানছে।'

'এই যে এখানে এই কাঠের পেপার ওয়েট। এটা আমি গত বৈশাখি মেলায় কিনেছি। এটা এই যে হাতে তুলে নিলাম। এখন আমি যদি এটা ছেড়ে দিই, এটা ভেসে থাকবে না। মাটিতে পড়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানবে এটা। আপনার কথা অনুযায়ী, এটা তো বস্তু নয়, একটা স্বপ্নের উপাদান। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানার কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই এটার। আছে? এই যে দেখুন। লক্ষ করুন।'

আমি পেপার ওয়েটটা ছেড়ে দিলাম। ঠকাস শব্দে সেটা মেঝেতে পড়ে গেল।

লোকটা চমকে উঠল। আমিও একটু চমকালাম। টের পেলাম আমি কিছুটা বেপরোয়া আচরণ করছি। পেপার ওয়েট তুলে আমি টেবিলে রেখে দিলাম।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'আমি কি এখন উঠব?'

'হ্যাঁ। উঠবেন। আমার আসলেই তাড়া আছে। তবে আপনি কাল আবার আসবেন। আমার মনে হয়, আমাকে দরকার হবে আপনার।'

'নিউরোলজিস্টের কাছে যাব না?' লোকটার কণ্ঠে কোথায় যেন একটা কৌতুক।

'না, যাবেন না। আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।'

লোকটা ওঠে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমরা হ্যান্ডশেক করি।

'আমি অপেক্ষা করব। সিরিয়াল দিতে হবে না। আমি বলে রাখব। আসবেন, কেননা আপনি চলে গেলেও কিন্তু এই ঘরটা এ রকমই থাকবে।'

লোকটা দরজার দিকে পা বাড়ায়।

'আপনি ছাতা এনেছেন?'

'না।'

'বাইরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে।'

'আমি ভিজব না,' বলল লোকটা, ঠোঁটে এমন এক লুকানো কৌতুক নিয়ে বলল, যেন কথাটার মধ্যে গভীর কোনো তাৎপর্য আছে।

লোকটা দরজার হাতলে হাত রেখেছে।

একবার, সেকেন্ডের একটা ভগ্নাংশের তরে মনে হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনের কোথাও কেউ যেন খুব করে চাইছে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে না যাক। লোকটা যাওয়ামাত্র কোথাও কিছু একটা বদলে যাবে।

লোকটা চলে গেল।

এতক্ষণে সিনেমা শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। আমি দ্রুত ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। ড্রাইভারকে ফোন দিচ্ছি। ধরে না। গাড়ির ভেতর ঘুমিয়ে গেছে বোধ হয়।

আমি দ্রুত ব্যাগটা কাঁধে নাই।

দরজার দিকে পা বাড়াই।

এ সময় একটা ঘটনা ঘটে।

আমার ব্যাগের একটা প্রান্ত গিয়ে লাগে টেবিলের ওপর রাখা পেপার ওয়েটের গায়ে। পেপার ওয়েটটা টেবিল থেকে গড়িয়ে যায়।

আমার মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

টেবিলের প্রান্ত পেরিয়ে গেলেও পেপার ওয়েটটা মেঝেতে পড়েনি।

কোনো অবলম্বন ছাড়া সেটা শূন্যে ভেসে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই শিল্পী

আমরা দুজন মিলে একটা ছবি আঁকছি। একটা ক্যানভাসে। আমরা দুই শিল্পী। আমাদের মধ্যে অমিলের শেষ নেই। দুটি ভিন্ন জগতে আমাদের অবস্থান। দুটি সমান্তরাল মহাবিশ্বে। আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। কারণ, দুটি মহাবিশ্বের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করে না দুই জগতের মধ্যে। কোনো টেলিযোগাযোগব্যবস্থা নেই। কোনো ধরনের যোগাযোগ কোনো দিন সম্ভবও না।

আমার মহাবিশ্বটা এগারো মাত্রার। অপরটা কত মাত্রার, আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, ছবি আঁকার এই ক্যানভাস ছাড়া দুটি জগতের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই। এই ক্যানভাস যেনবা একটা সুড়ঙ্গ, একটা রজ্জু, দুটি জগৎকে যা বেঁধে রেখেছে। বেঁধে না রাখলে জগৎ দুটি ভেসে আরও দূরে দূরে চলে যেত কি না, আমি জানি না। কেননা অপর জগৎ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কেউই কিছু জানে না। কিছু জানা সম্ভবও নয়। আমাদের সকল বিবরণ কেবল আমাদের এই মহাবিশ্বের জন্য প্রযোজ্য।

আমি শুধু এটুকু জানি, আমার স্টুডিওর একটা বিশেষ ক্যানভাসের তলে দুটি সমান্তরাল জগৎ একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে। এ যেন দুই যমজের জন্মমুহূর্তের নাভিরজ্জু বা অ্যাম্বিলিকাল কর্ড। কিন্তু এই নাভির মধ্য দিয়ে কিছুই বাহিত হয় না, কিছু রঞ্জক পদার্থ বা পিগমেন্ট আর কিছু অবয়ব ছাড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ একটা ছবি আঁকার ক্যানভাস। আয়তাকার। আকারে খুব বড়ও নয়। তিন ফুট বাই সাড়ে চার ফুট। আমার স্টুডিওর বেশির ভাগ ক্যানভাসই তা-ই। বড় ক্যানভাসে ছবি আঁকতে পারি না আমি।

কেরোসিন কাঠের ফ্রেমের ওপর মোটা মার্কিন কাপড় মুড়ে বানানো ক্যানভাসটাকে আলাদা করার জো নেই। কাপড়ের ওপর দু-দফায় সাদা কোটিং দেওয়া হয়েছে। সবগুলোতেই দেওয়া হয়। সেই একই দোকান থেকে এটা কিনেছি আমি, অন্যগুলো যেখান থেকে কেনা।

যেদিন প্রথম তুলি ছোঁয়াই ক্যানভাসে, মাস চারেক আগে, সেদিন এমন না যে আমার মাথায় বিশেষ কোনো চিন্তা কাজ করছিল। আনমনা ছিলাম আমি। একটা ধোঁয়াটে অবয়ব, একটা আকারহীন চিন্তা পাক খাচ্ছিল মাথার মধ্যে। কিন্তু ঠিক সেটাকেই যে ক্যানভাসে আকার দেব, এমন ভেবে ঠিক করিনি। প্রথম কয়েকটা তুলির আঁচড় আমি পরিকল্পনাহীনভাবেই দিই। সেই আঁচড় থেকে জন্ম নিতে থাকে অবয়ব আর চিন্তা আর পরিকল্পনার বীজ। সব সৃজনশীল কাজের বেলাতেই নিশ্চয় তা-ই হয়। শুরুতে সব সৃষ্টি থাকে আকস্মিক, তারপর ধীরে ধীরে পরিকল্পনার পরত পড়তে থাকে তার ওপর। ঢাকা পড়ে যেতে থাকে আকস্মিকতা। একসময় মনে হয়, পুরোটাই পূর্বনির্ধারিত।

আমি সাধারণত তেলরঙে আঁকি। অ্যাক্রিলিক ছুঁয়েও দেখি না। তেলরঙে আঁকার নানান ঝক্কি, নানান প্রস্তুতি। রঙের পিগমেন্টের সঙ্গে তার্পিন তেল, লিনসিড অয়েল মেশাও। এক পরত রং চড়ালে সেটা শুকানোর জন্য অপেক্ষা করো। এভাবে অতি ধীরে, একটু একটু করে ক্যানভাসে যা ফুটে ওঠে, সকলে তাকে বলে ছবি। আমি বলি, এটা একটা ধারণা।

আমার ক্যানভাসে আরেকজন কেউ আঁকছে—এটা বুঝতে আমার কয়েক দিন সময় লেগে গেছে। আমি আত্মভোলা, তন্ময় ধরনের শিল্পী না হলে হয়তো আরও আগে টের পাওয়া যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দিকটায় কেমন একটা ভৌতিক গা ছমছম করা অনুভূতি হয়েছিল। কোথাও একটা কিছু যে ঠিক নেই, এটা সবার আগে টের পেয়েছিল আমার ঘ্রাণশক্তি। ছবি আঁকার সময় বিশেষ করে তার্পিন তেলের গন্ধটা আমার খুব ভালো লাগে। একটা ঝাঁজালো গন্ধের নেশায় আচ্ছন্ন থাকি সারাক্ষণ। কিন্তু সেবার ছবি আঁকা শুরুর দ্বিতীয় দিন থেকে তার্পিন তেলের সঙ্গে আরেকটা কিছুর গন্ধ পেতে শুরু করি আমি। সেটাও ঝাঁজালো গন্ধই, তবে একেবারে অন্য রকম। কোনো চেনা গন্ধের সঙ্গে সেটার কোনো মিল নেই। একটা বুনো ফুলের গন্ধ যেন। তবে ফুলের গন্ধ যেমন স্নিগ্ধ, নরম হয়, সে রকম নয়। উগ্র গন্ধ। ভেবেছিলাম, বাইরে থেকে হয়তো বাতাসে ভেসে আসছে কোনো শিল্পকারখানার গ্যাসীয় অধঃক্ষেপ। জানালা বন্ধ করার পর গন্ধটা আরও বেড়ে যায়। টের পাই, এর উৎস ঘরের ভেতরেই কোথাও। আরও ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারি, ক্যানভাসের ভেতর থেকেই আসছে এই গন্ধটা। ক্যানভাসের রঙের পিগমেন্টের ভেতর থেকে।

দ্বিতীয় যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করলাম, তা হলো ক্যানভাসে রঙের বদলে যাওয়া। আমি এক রং ক্যানভাসে চাপিয়ে ঘুমাতে যাই। পরদিন ঘুম থেকে এসে দেখি রং বদলে গেছে। আগের দিন হয়তো সবুজ রং চড়িয়েছি, পরদিন এসে দেখি সেটা বেগুনি বা ভায়োলেট হয়ে আছে। ভার্মিলিয়ন রেড বদলে হয়ে যাচ্ছিল কোবাল্ট ব্লু। কখনো কখনো আমার চোখের সামনেই রং বদলে যাচ্ছিল। প্রথমটায় ভেবেছিলাম, আমি বোধ হয় বর্ণান্ধতা রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু চোখের ডাক্তার। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল। চোখ ঠিকই আছে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা এল ক্যানভাসে অবয়বগুলোর আকার বদলে যাওয়ার ধরন দেখে। ক্যানভাসে আমি কোনো বৃত্ত আঁকতে পারছিলাম না। যখনই কোনো বৃত্ত আঁকছি, সেটা কখনো উপবৃত্তের আকার নিচ্ছে, কখনো হয়ে যাচ্ছে অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সরল রেখাও আঁকতে পারছিলাম না আমি। সেগুলো ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছিল। তখনো এ সবকিছুকে আমার কোনো জটিল স্নায়বিক রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখছিলাম আমি। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলাম। তখনো টের পাইনি, নিরীহ এই ক্যানভাসের অতিনিরীহ উপরিতল আসলে দুটি ভিন্ন মহাবিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাকে ধারণ করে আছে। যেকোনো জ্যামিতিক অবয়ব বা যেকোনো রঙের পিগমেন্ট এখানে প্রবেশ করামাত্র স্থানের জটিল কাঠামো তাকে শুষে নিচ্ছে নিজের মধ্যে।

সপ্তম দিন আমি একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যাই, এই ক্যানভাসে অন্য কেউ আঁকছে। একই সঙ্গে। আর সেই শিল্পী আমাদের মহাবিশ্বের বাসিন্দা নয়। স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই, আমার একার পক্ষে এ রকম উন্মাদ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কোনো দিনই সম্ভব ছিল না। এ কাজে আমাকে প্রভাবিত করেছে আমার এক খ্যাপাটে বন্ধু। বন্ধুটি গণিতের অধ্যাপক। বদমেজাজ ছাড়াও একাডেমিক চক্রে তাঁর আরও নানা রকম কুখ্যাতি আছে। একদিন সে যখন আমার বাসায় বেড়াতে এল, কথাচ্ছলে ক্যানভাসের এই বিদঘুটে ভৌতিক আচরণের কথা আমি তাকে বলেছিলাম, আর সে তখন এসে দাঁড়িয়েছিল এই ক্যানভাসের সামনে। ইজেলে হেলান দিয়ে রাখা ক্যানভাসের দিকে সে চোখ কুঁচকে এমন করে তাকিয়ে ছিল, ঠিক যেমন করে লাল একফালি কাপড় হাতে মাতাদোর তাকিয়ে থাকে মাথা নিচু করা ষাঁড়ের দিকে।

দুটি মহাবিশ্বের পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার গাণিতিক অভিব্যক্তি কেমন হতে পারে, আমার বন্ধু প্রথম দিনই সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতির বিবরণ যে প্রচলিত কোনো গাণিতিক কাঠামো দিয়ে সম্ভব নয়, এর জন্য যে নতুন আর অভিনব এক গাণিতিক কাঠামো প্রয়োজন, সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি এর কিছুই আসলে ভাবছিলাম না। সম্পর্কহীন দুটি জগতের মধ্যে নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির বিনিময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে সম্ভব—আমি সেই চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, দুই জগতের মধ্যে অভিজ্ঞতার কোনো অর্থপূর্ণ বিনিময় কোনো দিনও সম্ভব নয়। কেননা, দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো অভিন্ন রেফারেন্স বিন্দু নেই। বিনিময়ের এই অসম্ভাব্যতার খানিকটা নজির পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার ভূখণ্ডে কলম্বাসের প্রথম পা রাখার সময়।

হতে পারে, ক্যানভাসের এক ক্ষুদ্র অস্থায়ী জানালায় এসে দুটি জগৎ আছড়ে পড়ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতির অদ্ভুত কৌতুককর দিকটি এ-ই ছিল যে, বিনিময়ের কোনো সম্ভাবনা যদি আদৌ থেকে থাকে, তা বাস্তবায়িত হচ্ছিল দুজন শিল্পীর তুলির ভেতর দিয়ে। আমি নিশ্চিত, চিত্রকলার ইতিহাসে এর আগে আর কখনোই একজন শিল্পীর তুলি এতটা সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠেনি, একজন শিল্পীর কাঁধে কখনোই এতটা মহাজাগতিক দায় এসে চাপেনি এর আগে। টের পেলাম, ক্যানভাসের সঙ্গে উল্লম্বভাবে ধরে রাখা আমার তুলির ওপারেই আরেকটি তুলি একই কৌণিক বিন্যাসে ধরে রাখা আছে। দুটি তুলি এক অপার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

কিন্তু শিগগিরই বোঝা গেল, এই নাভিরজ্জুর ভেতর দিয়ে অতি সীমিত কিছু নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোনো কিছুরই বিনিময় সম্ভব নয়। আর সেটাই সম্ভবত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পরিস্থিতি। দুটি জগৎ যখন আপাদমস্তক ভিন্ন কাঠামোয় গড়া হয়, দুটি জগতের অভিজ্ঞতার যখন কোনো অভিন্ন রেফারেন্স বিন্দু থাকে না, তখন দুই জগতের মধ্যে নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার বিনিময় ছাড়া আর কীই-বা ঘটা সম্ভব?

আগেই বলেছি, আমার উন্মার্গগামী বন্ধু এই অভিজ্ঞতার গাণিতিক কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টায় নিমগ্ন হলো। সে চাইছিল, এর ভেতর দিয়ে অপর মহাবিশ্ব সম্পর্কে যতটা পারা যায়, তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু আমাদের কাঁচামাল বড়ই সীমিত। আর এগুলো থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত কোনো বোধগম্য বিবরণে পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছিলাম। অজন্তার মন্দিরগুহায় জ্যাকসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোলকের চিত্র এঁকে রাখলে একজন পূজারি যেমন শূন্য চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকবে, আমাদের অন্তঃসারশূন্য গাণিতিক বিবরণগুলোর দিকেও আমরা তাকিয়ে ছিলাম সেভাবে।

আমি অনুমান করলাম, সমস্যাটা কিছু পরিমাণে ভাষাতাত্ত্বিক হতে পারে, যদিও ভাষাতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যগুলো সম্পর্কে আমার খুব বেশি ধারণা ছিল না। আমার অজ্ঞতাই এ ক্ষেত্রে বরং আমাকে সৃজনশীল করে তুলছিল। আমি বললাম, আমাদের পার্থিব ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক নির্মাণের যে সম্পর্ক, সেটার কোনো গাণিতিক কাঠামো যখন দাঁড় করানো যাবে, তখন যেকোনো নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাই গাণিতিক কাঠামোয় রূপান্তরযোগ্য হবে। ভেঙে সহজ করে বললে, ক্যানভাসে ভেসে ওঠা ছবির সঙ্গে তুলি নামক বস্তু আর রঙের পিগমেন্টের নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ককে গাণিতিক কাঠামোয় রূপ দিতে হবে। ছবি একটা চিন্তামাত্র, এটা এক পরিবর্তনশীল অস্থির প্রবাহ, যার ভেতরে অনবরত চিহ্ন আর অর্থের জটিল মিথস্ক্রিয়া চলছে। ছবি নামক এই চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে রঙের পিগমেন্ট, তার্পিন তেল আর ক্যানভাসের সুতার বুননের কোনো না কোনো যোগসূত্র অবশ্যই আছে, তা যত পরোক্ষই মনে হোক না কেন। সেটাকে গাণিতিক কাঠামোয় রূপান্তর করতে পারলে আমরা সেখান থেকে উল্টো পথে ভিন্ন আরেক ধরনের রঙের পিগমেন্ট, ভিন্ন আরেকটা তুলি আর সেই সঙ্গে সেই তুলি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ভিন্ন আরেক শিল্পীকে পুনর্নির্মাণ করতে পারব। আর সেখান থেকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা সম্ভব হবে পুরো একটা মহাবিশ্ব, এমন একটা জগৎ—যেটা আমাদের মতো নয়।

ক্যানভাসে তুলি চাপানোর সাড়ে চার মাস পর একদিন টের পেলাম, আমাদের ছবিটি আঁকা হয়ে গেছে। একজন শিল্পী কখন ঠিক করেন, তাঁর শিল্পকর্মটি পরিপূর্ণ হয়েছে, সেটা এক জটিল রহস্য বটে। কিন্তু এই ছবির ক্ষেত্রে আমি এবং আমরা দুজনেই সম্ভবত একই সময়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবিটা শেষ করে আমি ইজেল থেকে বেশ কিছুটা সরে এসে তাকাই ক্যানভাসের দিকে। আমি নিশ্চিত অপর প্রান্তে, স্থানের জটিল, অপার নদীর ভিন্ন পাড়ে অবস্থানকারী সেই শিল্পীও একইভাবে তাকিয়ে আছে এই ক্যানভাসের দিকে। আমরা কি একই ছবি দেখছি? একই অবয়ব? তাঁরও পাশে কি তাঁর কোনো গণিতবিদ বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে? শিল্প-অভিজ্ঞতার ভিন্ন এক গাণিতিক কাঠামো দাঁড় করানোর প্রাণান্ত চেষ্টা কি চালিয়ে যাচ্ছে সেই গণিতবিদও? আমরা সফল হইনি, কিন্তু যদি সেই গণিতবিদ সফল হয়ে থাকেন? আমরা কি কোনো দিনও জানতে পারব তাঁর সাফল্যের বার্তা?

আমি আমার বসন্তকালীন প্রদর্শনীতে টাঙালাম এই ক্যানভাস। গ্যালারিতে আর দশটা ক্যানভাসের পাশে সাদামাটাভাবেই রাখা হলো এটা। দর্শকেরা যখন এটার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, আমি সাবধানে তাকাচ্ছি তাঁদের চোখের দিকে, বিস্ময়ের কোনো অচেনা অনুভূতির চিহ্ন খুঁজছি আমি সেখানে। আর তখন নিজের অজান্তে কল্পনা করছি ভিন্ন একটা গ্যালারির কথা, ভিন্ন একসারি দর্শক আর তাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা কৌতূহলী অন্য এক শিল্পীর চেহারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে আসতে পারি?

আমি এসেছি কমিশন থেকে।

কমিশন মানে?

কমিশন ফর এলিমিনেশন অব ক্রুয়েলটি টুওয়ার্ডস রোবটস। অনেক বড় নাম। সংক্ষেপে কমিশন বললেই সবাই বুঝে যায়। আপনার সময় হবে?

আমি ভালো করে তাকালাম লোকটার দিকে। একটা সানগ্লাস পরে আছে। গায়ে একরঙা টি-শার্ট। বয়স চল্লিশের কোঠায়। কেমন চালাক চালাক একটা ভাব। দেখে সরকারি লোক মনে হয় না।

বললাম, আমার একটু তাড়া আছে। বের হব।

সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা সময় নেব।

আসুন।

লোকটা ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। লক্ষ করলাম, তাঁর হাতে একটা ছোট্ট বাহারি নোটবুক, স্কেচ খাতার মতো দেখতে। সেটা খুলে লোকটা কলম হাতে নিয়ে বসল।

বলুন, কী করতে পারি?

আমি কমিশনের ফিল্ড ইন্সপেকটর। আমাদের কমিশন সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে আপনার?

সামান্য।

রোবটদের ওপর কোনো নিষ্ঠুরতা, তাদের প্রতি রূঢ় আচরণের কোনো অভিযোগ পেলে আমরা সেটা ফার্স্ট হ্যান্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্সপেক্ট করি। কিছু ফর্ম পূরণ। আমাদের জোনাল অফিস একটা রিপোর্ট জেনারেট করে। সেটা কয়েকটা ডিপার্টমেন্টে যায়। এইটাই রুটিন।

কোনো অভিযোগ গেছে?

যায়নি।

তাহলে?

সেটাই খতিয়ে দেখতে এসেছি। কেন যায়নি।

মানে?

আপনি একটা রোবট কমিশন করেছিলেন। মেট্রোনোম হাইপার-অ্যান্ড্রয়েড বি-টু-সিক্স সিরিজের।

সে তো সতেরো বছর আগের কথা। সেটা এখন আর আমার সঙ্গে নেই।

কিন্তু আপনি সেটা ডিকমিশন করেননি।

করিনি। ভুলে গেছি। তাতে হয়েছেটা কী?

এগুলোকে এখন আর মামুলি গাফিলতি হিসেবে দেখা হয় না। নতুন কিছু আইন-কানুন হয়েছে। রোবটদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের ব্যাপারে এখন অনেক কড়াকড়ি। আমাদের কমিশন এখন আর ছোট প্রান্তিক দপ্তর নেই। একটা পূর্ণাঙ্গ সরকারি ডিপার্টমেন্টের অধীনে চলে গেছে।

হুম। শুনেছি সিনেটে নাকি কোটা চাওয়া হচ্ছে। অ্যান্ড্রয়েড কোটা। রোবটরা বসবে সিনেটে! হাস্যরসের একটা সীমা থাকা উচিত।

সিনেটে বসতে দেওয়ার দাবি মানা হয়নি বটে। তবে তাদের জোর আন্দোলন একেবারে বিফলে গেছে, বলা যাবে কি? বিশেষ করে টানা সতেরো দিনের ধর্মঘটের পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত সিনেটের একটা বিশেষ ককাস তো গঠন করতেই হলো। চাকা কিছুটা তো ঘুরেছে। সেটাই বা কম কী! এই ককাস এখন রোবটদের দিকটা দেখাশোনা করে। আমাদের কমিশন তাদের কাছেই জবাবদিহি করে। রিপোর্টের একটা কপি সেখানে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে আপনি এখানে সিনেট কমিটির প্রতিনিধিত্ব করছেন, বলতে চান নাকি?

ঘুরপথে তো তা-ই বটে।

কী সাংঘাতিক। আসল কথায় আসুন।

আপনি একটা মেট্রোনোম হাইপার-অ্যান্ড্রয়েড কিনেছিলেন।

একবার বলেছেন কথাটা।

কিন্তু আপনি সেটা ডিকমিশন করেননি। মানে ফেরত দেননি। অথচ সেটা এখন আর আপনার সঙ্গে নেই।

নেই, হারিয়ে গেছে। কিংবা স্ক্র্যাপ করেছি। কবেকার কথা।

আমাদের মনে হয়েছে, এ ক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে আর্টিকেল টোয়েন্টি এইট ট্রিগার করার অবকাশ আছে।

হোয়াট! সেটা আবার কী?

বুঝিয়ে বলছি। টোয়েন্টি এইট আওয়ার ল-এর কথা শুনেছেন? অনেক পুরোনো একটা আইন।

শুনিনি।

১৮৭১ সালে আমেরিকায় রেলওয়ে কোম্পানির জন্যে শুরুতে এই আইনটা তৈরি করা হয়েছিল। রেলের ওয়াগনে পশু পরিবহনের ক্ষেত্রে কতগুলো মান্য নিয়মকানুন। রেলযাত্রা যদি একটানা ২৮ ঘণ্টার বেশি লম্বা হয়, সে ক্ষেত্রে ওয়াগনে পরিবহন করা পশুর কতগুলো বিশেষ যত্ন নিশ্চিত করতে হয়। যেমন ধরা যাক, নির্দিষ্ট একটা সময় পরপর দানাপানি দেওয়া এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ট্রেন থামিয়ে জানালাগুলো খুলে দেওয়া, যাতে আলো-বাতাস প্রবেশ করে।

রেল কোম্পানির একটা প্রাচীন আইন এখানে কীভাবে প্রাসঙ্গিক?

ওই যে জানালা খুলে দেওয়া, আলো-বাতাস চলাচলের কথা বলা হচ্ছে, ওইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।

বুঝিনি।

বলছি। অ্যান্ড্রয়েড বা রোবটদের অধিকার নিয়ে যখন আইন-কানুন তৈরি করা শুরু হলো, তখন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার ঘটল। বেশির ভাগ বিধিবিধান ধার করা শুরু হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর পশু অধিকার-সংক্রান্ত আইন-কানুন থেকে। শিল্প বিপ্লবের কারণে ঊনবিংশ শতকে পশুপাখি আর মানুষের মধ্যেকার দূরত্ব ঘুচে যাচ্ছিল। ফলে মানবেতর পশুদের অধিকারের দাবি উঠতে শুরু করে। এবার ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের যুগে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এবার পশুদের জায়গায় রোবট বা অ্যান্ড্রয়েড। রোবট অধিকার সংরক্ষণে এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ আর্টিকেল টোয়েন্টি এইট এসেছে রেল ওয়াগনের ওই আইন থেকে।

আমার একটু তাড়া আছে। একটা শোক অনুষ্ঠানে যেতে হবে। লোকজন অপেক্ষা করছে। আইনের ইতিহাসবিষয়ক ক্লাস লেকচার শোনার মুডে আমি এখন নেই।

জানি। আপনার স্ত্রীর শোক অনুষ্ঠান। অতি সম্প্রতি আপনার যে একটা পারিবারিক ট্রাজেডি ঘটে গেছে, সেটা শুনেছি। আমি সমব্যথী। যে কথা বলছিলাম, আপনি যে বি-টু-সিক্স সিরিজের মেট্রোনোম হাইপার-অ্যান্ড্রয়েড কমিশন করেছিলেন, সেই সিরিজটার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর বাইরের অবয়ব সেকেলে ধাঁচের, একেবারে প্রথম যুগের রোবটদের মতো, যখন রোবটেরা দেখতে রোবটের মতো ছিল। নস্টালজিক লোকেরা এভাবেই চায়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, সিরিজটা নিঃসঙ্গ বুড়োবুড়িদের জন্য কাস্টমাইজ করা। ফলে এগুলোর মধ্যে বিশেষ কিছু অ্যালগরিদম প্রোগ্রামড করে দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন, এরা নিঃসঙ্গতা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। নির্জনতা এদের মধ্যে তীব্র সাফোকেশনের অনুভূতি তৈরি করে। আতঙ্কে এরা পাগলের মতো হয়ে যায়। এক ধরনের অ্যাকিউট সাইকোলজিক্যাল ট্রমার ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ আরকি। এই বিশেষ সিরিজের আরেকটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হলো অ্যাকলুফোবিয়া।

সেটা কী জিনিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারভীতি। অন্ধকারে এদের দশা যে কী করুণ হয়, চিন্তা করা যায় না! অবর্ণনীয়! বীভৎস!

তো, সমস্যা কী?

সমস্যা হলো, এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি জানতেন। ভালো করে জানতেন। কেনার সময় ম্যানুয়েল দেওয়া হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী এক দিনের একটা সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণও আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাছে তথ্য আছে, আপনি আপনার ওই হাইপার-অ্যান্ড্রয়েডটাকে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতেন।

বাজে কথা।

এবং আপনি সেটাকে একা বাড়িতে তালাবদ্ধ করে রেখে মাঝে মাঝে প্রমোদভ্রমণে বের হতেন। কয়েক দিনের জন্যে। পুরো বাড়িতে একটা মেট্রোনোম হাইপার-অ্যান্ড্রয়েড একা। এর চেয়ে নিষ্ঠুর আচরণ আমরা চিন্তা করতে পারি না।

কিন্তু আমি এই সব কেন করব?

করবেন এক ধরনের জুস্যাডিজম থেকে। পশুদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে মর্ষকামী লোক যে কারণে মজা পায়। আপনি এক ধরনের জুস্যাডিস্ট।

ধরুন আমি জুস্যাডিস্ট। কিংবা ব্যাকরণ মেনে যদি বলি, ধরুন আমি রোবো-স্যাডিস্ট। তাতে?

এটা প্রমাণিত হলে আপনার সাজা হবে। নতুন আইন বড় কড়া।

কী সাজা?

আর্টিকেল টোয়েন্টি এইটের সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী, আপনার নামের পাশে লাল কালিতে দাগ পড়ে যাবে। শুধু মেট্রোনোম সিরিজের নয়, ভবিষ্যতে কোনো বর্গের, কোনো সিরিজের, কোনো হাইপার-অ্যান্ড্রয়েডই আপনি আর কমিশন করতে পারবেন না। মোটা অঙ্কের জরিমানাও গুনতে হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আর্থিক সামর্থ্য সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা নেই। আমি এখন উঠব।

আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

কোথায়?

শোক অনুষ্ঠানে?

না। পারেন না। আপনার সঙ্গ আমার অসহ্য লাগছে।

আমার আরও কিছু বলার আছে। সেটা যেতে যেতে বলি?

গাড়ি ছুটে চলেছে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে।

আমি পাশে বসা লোকটার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করছি। লোকটা আবার সেই খাতা খুলে কলম হাতে বসেছে। কিছুই লিখছে না। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এ তো খুবই ভোগাবে দেখছি।

লোকটা বলল, আপনার স্ত্রীর দুর্ঘটনা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক।

আমি চুপ করে থাকি।

গাড়িটা কি আপনিই চালাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ।

শুনছি এটা নিয়ে এক ধরনের কানাঘুষা শুরু হয়েছে।

কী রকম?

মানে নিন্দুকেরা যা করে আরকি। আপনার তো শত্রুর অভাব নেই। তারাই হয়ত ছড়াচ্ছে।

কী বলে তারা?

বাদ দিন। আমরা ওই রোবটটার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

মেট্রোনোম হাইপার-অ্যান্ড্রয়েড সিরিজের?

লোকটা আমার দিকে তাকায়। আমার কণ্ঠস্বরের ঠেসটা ধরতে পেরেছে মনে হলো।

হ্যাঁ। বি-টু-সিক্স সিরিজের। ওটার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো, তার প্রমাণ আমরা কীভাবে পেলাম, অনুমান করতে পারেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি। আমার স্ত্রীর ডায়েরি থেকে। ও নিয়মিত ডায়েরি লিখত, আমি জানি।

আপনি বুদ্ধিমান।

একটা মুচকি হাসি ঝুলিয়ে রেখে লোকটা আবার চুপ করে বসে থাকে। নীরবতা ভাঙতে আমি নিজে বাধ্য হয়ে কথা বলি।

একটা ব্যাপার আমাকে বুঝিয়ে দিন তো, আমার বাসায় একটা অত্যন্ত সেকেলে হাউসহোল্ড রোবটের প্রতি নির্দয় আচরণ করা হতো, তা-ও বছর সতের আগে, এটা প্রমাণ করা আপনার জন্যে এত জরুরি কেন?

আইন-কানুন বদলেছে। অনেক কিছুতে এখন কড়াকড়ি।

বাজে কথা রাখুন। আমি অত গর্দভ না যে কিছুই আঁচ করতে পারব না। আপনি এসেছেন আমার স্ত্রীর মৃত্যুরহস্য তদন্ত করতে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আসল কথায় না গিয়ে আপনি গৃহকাজে নিযুক্ত একটা নগণ্য রোবটের কথা বার বার আনছেন কেন।

কারণ আমি যদি প্রমাণ করতে পারি, আপনি রোবটটার প্রতি নির্দয় আচরণ করতেন, জেনেশুনে করতেন, কোনো কারণ ছাড়া শুধু এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পাওয়ার জন্য করতেন, তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে, আপনার স্ত্রীর ওই দুর্ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা ছিল না। যেটা কানাঘুষা চলছে, সেটাই আসলে ঠিক—আপনি তাঁকে হত্যা করেছেন।

আমি তাকিয়ে থাকি লোকটার দিকে। নিরীহ লোকটার সাহসের তারিফ করতে হয়।

লোকটা বলল, যোগসূত্রটা ধরতে পারছেন না? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। সুয়েতোনিয়াস নামে এক রোমান ইতিহাসবিদ ছিলেন, নাম শুনেছেন?

আবার বক্তৃতা!

উনি ১২ জন রোমান সম্রাটের ওপর একটা বই লিখেছিলেন, নাম *দ্য টুয়েলভ সিজারস*। সেখানে দোমিতান নামে এক সম্রাটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলা আছে। দোমিতানের একটা খুব বিদঘুটে স্বভাব ছিল। তিনি নানা রকম পোকামাকড় ধরতেন। তারপর সুচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলো হত্যা করতেন। দিনের বড় একটা সময় তিনি ব্যয় করতেন এ কাজে।

তো?

গুজব চালু আছে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন।

অর্থহীন কথাবার্তা।

এবার আসি আসল কথায়। নতুন ধারার অপরাধবিজ্ঞানের একটা বড় মাথাব্যথা হলো, খুনি ব্যক্তির আচরণের কিছু সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন বের করা, যাতে আগাম ইন্টারভেন করা যায়। এ ক্ষেত্রে হোমিসাইডাল ট্রায়াড নামে একটা ধারণা অপরাধবিজ্ঞানে প্রায় ধ্রুব সত্যের মর্যাদা পেয়ে গেছে। এটার আদি নাম ছিল ম্যাকডোনাল্ড ট্রায়াড। গবেষণা করে দেখা গেছে, বিশেষ তিনটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ যদি কারও মধ্যে দেখা যায়, তাহলে একশ ভাগ সম্ভাবনা, লোকটা খুনি হবে। তবে এর জন্যে তিনটা বৈশিষ্ট্যই থাকতে হবে। একটা বা দুটা থাকলে হবে না।

তো, কী সেই তিন বৈশিষ্ট্য?

প্রথমটা হলো, লোকটার তোতলানোর স্বভাব থাকবে। ছোট বেলায় তো বটেই, বড় হয়েও। দ্বিতীয়ত, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি লোকটার থাকবে অন্ধ আকর্ষণ। ছোটবেলায় খেলনা অস্ত্রের প্রতি। বড় হয়ে সত্যিকার আগ্নেয়াস্ত্র। আপনার মধ্যে দুটি লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় দেখা গেছে। ম্যাকডোনাল্ড ট্রায়াডের তৃতীয় লক্ষণটি হলো রোবটদের প্রতি নিষ্ঠুরতা। এবং এটা আপনার স্বভাবে আছে বলে আমি আদালতে প্রমাণ করতে পারব।

প্রমাণ হলে?

আদালত আর বাড়তি কোনো প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করবে না। এটা অনেকটা গণিতের মতো। আপনার ফাঁসি হয়ে যাবে। নতুন সাক্ষ্য আইনে এখন ম্যাকডোনাল্ড ট্রায়াডকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। এটা অনেকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেন্টাল ফিঙ্গারপ্রিন্টের মর্যাদা পায়। বলতে পারেন, এটাই সিনেটের অ্যান্ড্রয়েড ককাসের এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় সাফল্য। আমি এখন নামব। সামনের ওই মোড়টায় আমাকে নামিয়ে দিলেই চলবে।

শোকসভায় যাবেন না?

মানুষের শোকসভায় অ্যান্ড্রয়েডদের যেতে মানা।

আমি গাড়ি থামাতে বলি। লোকটা নেমে যায়।

তার হাঁটার ভঙ্গিতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদ্বন্দ্বী

১৯৬৮ সালের এক শরতের দুপুরে লাহোর জংশন রেলস্টেশনে পা রেখে আমার মনে হয়েছিল, কবিরা বড় বজ্জাত প্রজাতির। তাদের হৃদয় পঙ্কিল, অস্থিমজ্জা অসূয়াদুষ্ট। এই ধারণা আমি আজও ত্যাগ করতে পারিনি।

রেলস্টেশনের দুর্গ আকৃতির লাল ইটের ভবনের বাইরে আমাকে স্বাগত জানাতে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে নামকরা কবিদের একজন—সুলতান চুঘতাই। একটা ধূসররঙা মাজদা কাপেলার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো পঞ্চাশোর্ধ্ব লোকটিকে দেখে অবশ্য বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, ইনি উর্দু কবিতায় নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছেন। লোকটি মোটেও সৌম্যকান্তি নন, চেহারা বিশেষত্বহীন। দেখে বোঝার উপায় নেই, এ লোক পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে বনেদি পরিবারগুলোর একটির সন্তান।

সুলতান চুঘতাই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'ওয়েলকাম টু দ্য সিটি অব পোয়েটস।'

কথাটা উনি সম্ভবত বাড়িয়েই বলেছিলেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে লাহোরে উর্দু কবিতার এমন কোনো জোয়ার বইছিল না।

কবিতার সমঝদার আমি কখনো ছিলাম না। আইনকানুন, মামলা-মোকদ্দমা আমার কর্মক্ষেত্র। ঢাকা হাইকোর্টের একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাঁদরেল আইনবিদের চেম্বারে নবিশ হিসেবে আমি সবে যোগ দিয়েছি। আমি লাহোরে পা রেখেছি তাঁর সহকারী হিসেবে। সুলতান চুঘতাই চুরির মামলা ঠুকেছেন তাঁর ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী কবি তালাল লুধিয়ানির বিরুদ্ধে।

লাহোরের হাকিম আদালতে চুঘতাই যে অভিযোগ এনেছেন, তা এতই বিস্ফোরক, তখনকার দিনের লাহোর শহর কেঁপে উঠেছিল। অভিযোগ প্লেজিয়ারিজম বা কুম্ভিলকবৃত্তির। লুধিয়ানি চুরি করেছেন চুঘতাইয়ের লেখা।

ওই রাতে পূর্ব লাহোরের সোদিয়াল এলাকায় ভিক্টোরিয়ান কায়দায় বানানো চুঘতাই পরিবারের প্রাসাদোপম বসতবাড়ির ছাদ পর্যন্ত বইয়ে ঠাসা লাইব্রেরি কক্ষে বসে আমি বললাম, 'শুনেছি আপনার হাতে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। আদালতে আপনি কিছুই দাঁড় করাতে পারেননি। হাকিম আদালত আপনার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিয়েছেন। জজকোর্টও।'

কিছুক্ষণ আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে চুঘতাই বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছেন। তো?'

'আপনি লাহোর হাইকোর্টে মামলা করেছেন। শুনছি, সেখানেও হারতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ আপনার অভিযোগ একেবারে কাঁচা।'

'সে জন্যই তো সুদূর ঢাকা থেকে আইনজীবী আনিয়েছি। আপনার সিনিয়র ব্যারিস্টার আরশাদ আজিজ আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। উনি এত জাঁদরেল উকিল, পুরো পাকিস্তানে সবাই ওনাকে একনামে চেনে। আমি চেয়েছিলাম উনি নিজে আসুন। এখন যেহেতু উনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, ধরে নিচ্ছি বয়সে তরুণ দেখালেও আপনার মধ্যে গুণপনার কমতি নেই। আপনি নিজে প্রমাণ জোগাড় করুন। যে পদক্ষেপ নিতে হয়, নিন।'

'আপনার কোন কবিতা উনি চুরি করেছেন বলছেন?'

'একটি বা দুটি কবিতা নয়, উনি একের পর এক আমার তিনটি কিতাব মেরে দিয়েছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন নাশতার টেবিলে বসে আমি বললাম, 'লুধিয়ানি আপনার যেসব বই নকল করেছেন বলে আপনি অভিযোগ করেছেন, সেসব বই আপনি আদালতে দাখিল করতে পারেননি, চুঘতাইজি।'

চুঘতাই উদাস গলায় বললেন, 'পারিনি।'

'কেন?'

'কারণ, আমার বই ছাপাই হয়নি।'

'যে বই ছাপা হয়নি, সেই বই নকল করা হয়েছে—এই অভিযোগ টিকবে?'

'আমার কাছে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আছে। নিজ হাতে লেখা।'

'তাতে কী! ডিফেন্স বলবে, লুধিয়ানির ছাপানো বই থেকে আপনি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন।'

'তা-ই তো বলেছে।'

'তাহলে আর কী, কেস ফিনিশড। কিছুই করার নেই।'

এই প্রথম ভদ্রতার খোলস খসে গিয়ে চুঘতাইয়ের চোখে ক্রোধের ছাপ। বললেন, 'কিছুই করার নেই মানে! এই বেইনসাফির কোনো বিচার নেই! একটা চোর, একটা ভিখারির সন্তান দিনের পর দিন আমার সব কবিতা, সব ছন্দ, সব অক্ষর চুরি করে নিয়ে যাবে, আমার তৈরি উপমা, শব্দে শব্দে ঠোক্কর খাওয়া ধ্বনিমাধুর্য দখল করে আমারই প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠবে, তাঁকে বলা হতে থাকবে উর্দু কবিতার নয়া সিতারা, আর তা মেনে নিতে হবে আমাকে? শুনে রাখুন, সাহিত্যের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় জোচ্চুরি, বড় বেইনসাফি কোনো দিন হয়নি।'

আমি বললাম, 'আপনি আপনার পরবর্তী পাণ্ডুলিপি সুরক্ষিত রাখুন, চুঘতাইজি। পাণ্ডুলিপি যাতে কেউ চুরি করতে না পারে।'

চুঘতাই তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'পরেরটাও চুরি হবে। আমি নিশ্চিত।'

'আপনি লিখে সিন্দুকে ভরে রাখুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পৃথিবীর কোনো সিন্দুক ওই ছুঁচোকে আটকাতে পারবে না।'

'আপনি বাড়ির লোকজনকে সন্দেহ করছেন, বা প্রেসের লোকজনকে?'

'না।'

'তাহলে?'

'পুরোটা বুঝতে হলে উকিল সাহেব, আপনাকে উর্দু কবিতার ইতিহাস জানতে হবে। বুঝতে হবে এর সাম্প্রতিক প্রবণতা। এবং বুঝতে হবে চুঘতাই আর লুধিয়ানির দ্বন্দ্বের স্বরূপ। একমাত্র তাহলেই আপনি পারবেন পুরো বিষয়টি আদালতের সামনে তুলে ধরতে। আমি চাই, আপনি আদালতে বিষয়টা বিস্তারিত তুলে ধরুন শুধু। জিতি না-জিতি, কথাগুলো অন্তত বলা তো হোক।'

তো, এইভাবে কবিতাবিমুখ এক আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও শুধু মক্কেলের ফেরে আমাকে উর্দু কবিতার গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়েছিল। পরবর্তী কয়েকটি দিন রসুল পার্কের ছায়াঢাকা তরুবীথি বেয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চুঘতাই আমার সামনে উর্দু কবিতার বিশাল ভূখণ্ডের দরজা উন্মোচন করতে শুরু করেন। সেই দরজায় উঁকি দিয়ে আমি ভেতরে অদ্ভুত এক মোহনীয় বাগিচা দেখতে শুরু করি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি চুঘতাইয়ের কথার জাদুতে বুঁদ হয়ে থাকতাম। পঞ্চম দিন থেকে টের পেতে শুরু করি, আমার মক্কেলের মামলার সুরাহা কবিতার এই গোলকধাঁধাময় গলিপথের ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে, আইনের ধারা-উপধারার মধ্যে তা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। সে ক্ষেত্রে একজন পরিপূর্ণ কবি-বিচারকই কেবল আমার মক্কেলকে ইনসাফ দিতে পারেন। আর কেউ নন।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে পরবর্তী দশটি বছরের উর্দু কবিতার ইতিহাস চুঘতাই আর লুধিয়ানির দ্বন্দ্বযুদ্ধের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁদের কলম ও ঠোঁটের মধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে উর্দু কবিতার দুটি শক্তিশালী স্রোতোধারা প্রবহমান হয়েছে। এই দুই সমবয়সী কবি কী করে ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে ঘোরতর শত্রু হয়ে উঠলেন, সেই গল্প লাহোরের সাহিত্য আড্ডার মুখরোচক কিংবদন্তি। তাতে সত্যের পাশাপাশি অনেক মিথ্যার খাদও মিশে আছে। যেমন কেউ কেউ বলেন, দেশভাগের পর লুধিয়ানা থেকে লাহোরে আসা মোহাজির, কপর্দকহীন কিশোর লুধিয়ানি বেশ কিছুদিন চুঘতাই পরিবারে আশ্রিত ছিলেন। সে বয়সে দুজনই ওই পরিবারের এক বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সেখান থেকে।

কিংবদন্তি যা-ই চালু থাক, লাহোরের উত্তর অংশের বনেদি এলাকায় বেড়ে ওঠা চুঘতাই আর দক্ষিণ অংশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মহল্লায় বসবাসকারী লুধিয়ানির কবিতার জগৎ যে ভিন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক ছিল। তরুণ বয়সে লুধিয়ানি হকিকত-পসন্দ বা বাস্তববাদ নামক একটি নতুন কাব্য-আন্দোলনের জন্ম দেন। এটির দুর্বিনীত অনুসারীরা উর্দু কবিতায় চল্লিশের দশক থেকে চালু রুহানী বা মরমি ধারার কবিদের নির্দয় সমালোচনা করতেন। বলতে কি, চুঘতাই ছিলেন এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তিক্ত বিদিষ্ট চুঘতাই একপর্যায়ে ফরাসি প্রতীকবাদী কবিদের প্রভাববলয়ে আসেন, তাতে ষাটের দশকের মাঝামাঝি তাঁর কবিতা নতুন দিকে বাঁক নেয়। উর্দু কবিতায় প্রতীকবাদী ধারা যে দ্রুত বিকাশ লাভ করতে শুরু করে, সেটার একক কৃতিত্ব চুঘতাইকেই দিতে হবে। পরবর্তীকালে পরাবাস্তববাদী উপকরণও মিশে যেতে থাকে তাঁর কবিতায়। এ সময় চুঘতাইয়ের জনপ্রিয়তা এত বেড়ে যায় যে তিনি একপ্রকার গার্হস্থ্য নামে পরিণত হন। তাঁর কবিতার বই নেই, পুরো পশ্চিম পাকিস্তানে এমন মধ্যবিত্তের বাড়ি খুঁজে পাওয়া যেত না।

চুঘতাইয়ের জনপ্রিয়তার চাপে লুধিয়ানির বাস্তববাদী ধারাটি শুকিয়ে যেতে শুরু করে। একটা পর্যায়ে লুধিয়ানির কলম থেমে যায়। বেশ কিছুদিন তিনি নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘিরে নানা রকম গুজব ডালপালা ছড়াতে শুরু করে। বছর দুয়েক পর তিনি ফিরে আসেন এবং *গুলোঁ কি ম্যাহেক* নামে তাঁর একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। সমালোচকেরা সবাই স্বীকার করেন, এই বইয়ের কবিতাগুলো লুধিয়ানির এত দিনকার প্রবণতা ও ভঙ্গিমার অনেকটাই বিপরীত। তিনি এক নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেছেন।

কিন্তু বইটি প্রকাশের পরপরই হইচই শুরু করে দেন চুঘতাই। লাহোর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে তিনি যে অভিযোগ করেন, তা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে কেলেঙ্কারিময় ইলজাম। লুধিয়ানির বিরুদ্ধে তিনি কুম্ভিলকবৃত্তির অভিযোগ আনেন। প্রমাণ হিসেবে নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি হাজির করেন। ওই দিনের পর থেকে অনেককেই বলতে শোনা গেছে, ঈর্ষাকাতর চুঘতাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছেন।

পরবর্তী দুই বছরে লুধিয়ানির আরও দুটি কবিতার বই বের হয় এবং দুবারই একইভাবে পাণ্ডুলিপি চুরির অভিযোগ আনেন চুঘতাই। দুবারই তিনি হাস্যরসের জন্ম দেন। এর পরপরই আদালতে মামলা।

'লোকটা জোচ্চোর, উকিল সাহেব। এ নিয়ে মনে কোনো সন্দেহ রাখবেন না', বললেন চুঘতাই।

আমি তাঁর অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'কিন্তু প্রমাণ তো লাগবে।'

'ওর কবিতাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। ও লিখেছে, 'লৌট আও বো চমনমে/যাহা গুলাবোঁ কি পাঙ্খরি নিশাবাজ হো কে/শোয়ে হ্যায় ঘাস কি গালিচে পে।' (ফিরে এসো সেই বাগানে/যেখানে গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে/লুটিয়ে আছে ঘাসের গালিচায়)। এই চিত্রকল্প তৈরি করা ওর বাবার পক্ষেও সম্ভব নয়। এই ভাষা ওর নয়। আরও প্রমাণ দেব? গত দেড় বছরে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটাও নতুন কবিতা লিখিনি। এই দেড় বছরে ওর নতুন বই বের হওয়াও বন্ধ। বলে কিনা রাইটার্স ব্লক।'

আমি বললাম, 'আপনার পাণ্ডুলিপির কবিতাগুলো লেখার পর নিচে তারিখ দেওয়া থাকে না?'

প্রশ্ন শুনে চুঘতাই বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর যা বললেন, সে রকম অদ্ভুত কথা আমি জীবনে শুনিনি। তিনি বললেন, 'ওর কবিতার বই বের হচ্ছে আমার কবিতাগুলো লেখারও আগে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও আমার কবিতাই চুরি করছে।'

স্তম্ভিত হয়ে চুঘতাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি আমি।

চুঘতাই বলেন, 'আপনি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা, তা-ই না?'

'আপনি ব্যাখ্যা করে বলুন।'

'আমার পাণ্ডুলিপি লেখার অন্তত ছয় মাস থেকে দেড় বছর আগে বের হচ্ছে ওর কবিতার বই। তবু বলব, ও আমার পাণ্ডুলিপিই চুরি করছে।'

'যে পাণ্ডুলিপি লেখাই হয়নি, সেই পাণ্ডুলিপি চুরি হয় কী করে?'

চুঘতাইয়ের চোখে অসহায় চাহনি। তাঁকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে কী চিন্তা দানা বাঁধছে, তিনি বোধ হয় টের পেতে শুরু করেছেন।

চুঘতাইদের বাগানবাড়ির দোতলার বারান্দায় সারা রাত বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবলাম আমি। ভোরের দিকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

নাশতার টেবিলে চুঘতাইয়ের মুখোমুখি বসে বললাম, 'উপমা-উৎপ্রেক্ষা, কবিতার শব্দচয়ন প্রবণতা, চিত্রকল্প তৈরির কৌশল—যা-ই বলুন, এগুলো কিছুই এজলাসে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি কি ঢাকায় ফিরে যাচ্ছেন?'

'না। একটু আগে টেলিগ্রাম করে এলাম, ফিরতে আরও এক মাস দেরি হবে।'

'কী করবেন আপনি?'

'চোরকে হাতেনাতে ধরব।'

'কীভাবে?'

'ফাঁদ পেতে। ঢাকায় আমার এক কবিবন্ধু আছে। আরিফ হাসান। ব্যর্থ কবি। বছর পাঁচেক আগে তাঁর একটি কবিতার বই বেরিয়েছে। এখানে আপনার এই বাগানবাড়িতে বসে বসে আমি ওই বাংলা কবিতার বইটি এখন উর্দুতে অনুবাদ করব। গোপনে। আপনি সেগুলো আবার কপি করবেন। হুবহু। তারপর আপনার নামে ওই কবিতার পাণ্ডুলিপি ছাপতে জমা দেবেন প্রকাশকের কাছে। ছাপবেন না। ছাপতে দেবেন শুধু।'

চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। তাঁর চোখ চকচক করছে।

১৯৬৮ সালের ৭ নভেম্বর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গেল। বাংলা কবিতার বইয়ের নাম ছিল *সময়চক্র*। উর্দুতে সেটা দাঁড়াল *ওআক্ত কা সিলসিলা*। প্রকাশককে দেওয়া হলো ৯ নভেম্বর। আর তখনই খবর পেলাম, ১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ কবি তালাল লুধিয়ানির নতুন বই বেরিয়ে গেছে, নাম *ওআক্ত কা সিলসিলা*। সেই বইয়ের জন্য তিনি অল পাকিস্তান উর্দু একাডেমির পুরস্কারও পেয়ে গেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো আমার লাহোরে পা রাখারও দেড় বছর আগে এসব ঘটে গেছে।

আমি আশ্চর্য হলাম না। আমার কাছে সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। লুধিয়ানি চুরি করছেন পৃথিবীর তাজ্জবতম উপায়ে। এই চুরি ঠেকানোর কোনো পথ নেই।

কিন্তু আমার পাতা ফাঁদে তাঁকে পড়তেই হলো।

ঢাকার কবির বাংলা কবিতা মেরে দেওয়ার অভিযোগে মামলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো লুধিয়ানির বিরুদ্ধে। তার চেয়েও বড় অভিযোগ, উর্দু একাডেমির সঙ্গে প্রতারণা করে পুরস্কার বাগানো। দ্বিতীয় অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলো।

লুধিয়ানিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পারার কথা নয়। সময়ের জটিল গলিপথে লুকিয়ে পড়ার কৌশল তিনি জেনে গেছেন। তাঁর লেখার কক্ষের দরজা ভেঙে পুলিশ ঢুকে দেখে, ঘর খালি। লুধিয়ানির স্ত্রীর দাবি, পুলিশ দরজা ভাঙার সময়ও ভেতরে স্বামীর গলার আওয়াজ তিনি শুনেছেন।

ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিখণ্ডিত

আমি পরপর কয়েকটি ঘটনা বলব। একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পর্কহীন মনে হতে পারে। তবু একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন, প্লিজ। শুনলে এগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেতে পারেন। পাবেনই। আর শেষে আমি আপনাকে বলব, কেন এখানে এসেছি।

হিলারি স্টেপস কী জিনিস জানেন? জানার কথা নয়। এভারেস্ট শৃঙ্গের ঠিক আগে আগে একটা বিরাট পাথরের চাঙড়। ১২ মিটার উঁচু খাড়া একটা দেয়ালের মতো। ধরুন জেলখানার দেয়াল কত উঁচু হয়? চৌদ্দ-পনেরো ফুট হবে। সেটাই কী দুর্লঙ্ঘ্য লাগে! আর এ তো পাক্কা ১২ মিটার! যাঁরা এভারেস্টে চড়েন, পর্বতারোহীরা, তাঁদের চোখে এটা হলো সর্বশেষ বড় চ্যালেঞ্জ। সাড়ে আট হাজার মিটারের ওপরে, অত উঁচুতে, একটা দৈব নিষেধ যেন দাঁড়িয়ে আছে—বলছে, এসো না, উঠো না। কাব্য করছি না। বইপত্রে পড়ুন, এটার কথা বলা আছে, হিলারি স্টেপসের কথা। ওইটা পার হতে বিরাট কসরত। অনেকে ওখান থেকে ফিরে আসে। কী আফসোস দেখুন! এভারেস্টের মাত্র ৫৮ মিটার নিচ থেকে ফিরে আসা। স্বর্গের দরজায় কড়া নেড়ে ফিরে আসা আরকি।

গত সপ্তাহে পত্রিকায় একটা খবর এসেছে, আপনার চোখে পড়ার কথা। টিম মোসেডেল নামে এক ব্রিটিশ পর্বতারোহী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভারেস্ট থেকে নেমে এসে প্রেস কনফারেন্স করে বললেন, হিলারি স্টেপস আর নেই। নেই মানে, যাওয়া-আসার পথে তিনি পাথরটা দেখতে পাননি। কোথায় গেল? সম্ভবত ধসে পড়েছে। দু বছর আগে নেপালে একটা ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছিল, আপনার মনে থাকার কথা। মোসেডেলের অনুমান, সেটার ঝাঁকিতে পড়ে গিয়ে থাকবে পাথরটা। হতেই পারে। এ রকম ভূকম্পনের ঝাঁকাঝাঁকিতে কত কিছুই তো অদলবদল ঘটে। স্বয়ং হিমালয় পর্বতখানাই তো উঠে এসেছে এমন এক তুলাধোনা ঝাঁকুনিতে।

তো, হিলারি স্টেপস নেই, ভালো কথা। না থাকলে সমস্যা তো নেই। যাঁরা এভারেস্টে চড়বেন, তাঁদের জন্য সুসংবাদ। কিন্তু গোল বাঁধল এর দুদিন পরে। অং শেরিং নামে এক শেরপা কাঠমান্ডুতে পাল্টা প্রেস কনফারেন্স করে বললেন, হিলারি স্টেপস ওখানেই আছে। বহাল তবিয়তে। অং শেরিং নিজে সেটা দেখেছেন। শুধু শেরিং নন, আরও অনেক শেরপাই দেখেছেন। মোসেডেলের আগে-পরে যাঁরা এভারেস্টে উঠেছেন, তাঁরা সবাই সেটা দেখেছেন। এখনো দেখছেন।

তাহলে ঝামেলাটা কোথায়? অং শেরিং বললেন, মোসেডেলের দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে। অতিরিক্ত তুষারে পাথরটা হয়তো এমনভাবে ঢাকা পড়ে গেছে, চোখে দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাক না-যাক, পাথরটা আছে। তার জায়গাতেই আছে। সরে তো যায়ইনি, একটু টালও খায়নি। যাঁরা এভারেস্টে চড়ছেন, তাঁদের আগের মতোই কষ্ট করে পাথরটা ডিঙাতে হচ্ছে।

ব্যাপারটা এখানেই মিটে যাওয়ার কথা। শেরপারা যুগ যুগ ধরে এই পথ বেয়ে উঠছেন, নামছেন। জায়গাটা তাঁদের হাতের তালুর মতো চেনাজানা। তাঁরা যেটা বলবেন, সেটাই ধ্রুব সত্য। কিন্তু সমস্যা হয়েছে কী, মোসেডেলও ফেলনা কেউ নন। এ নিয়ে ষষ্ঠবার এভারেস্টে চড়েছেন তিনি। এই পথ তাঁরও কম চেনা নয়। হিলারি স্টেপসের মতো অত বড় একটা পাথরখণ্ড থাকার পরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটাকে নেই ভাবার মতো আনাড়ি তিনি নন। আর তা ছাড়া মোসেডেল খাঁটি ব্রিটিশ চিজ। তিনি জায়গাটার একটা ছবিও তুলে এনেছেন। তাতে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, পাথরটা নেই। চার বছর আগে পঞ্চমবার যখন এভারেস্টে চড়েছিলেন, তখনকার ছবিও দেখালেন মোসেডেল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একই অ্যাঙ্গেলে তোলা ছবি। তাতে দেখা যাচ্ছে পাথরটা আছে। তার মানে মধ্যবর্তী কোনো এক সময় তা নেই হয়ে গেছে। সেটা ২০১৫ সালের ভূমিকম্পের সময় ঘটেছে বলে অনুমান করলে খুব বেশি কষ্টকল্পনা মনে হয় কি?

এদিকে শেরপা অং শেরিংই বা ছাড়বেন কেন। ছবি তিনিও বের করলেন। একই জায়গার ছবি। একই অ্যাঙ্গেলে। সেখানে পাথরটা আছে।

ব্যাপার তো খুবই জটিল হয়ে গেল। একটা পাথর আছে, আবার নেই। কিংবা একজনের জন্য আছে, আরেকজনের জন্য নেই। এই প্যাঁচ খুলবে কে?

আপনি শুনছেন তো? বিরক্ত লাগছে না তো? এবার তাহলে আরেকটা ঘটনা বলি। একটু অতীতের।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। ঘটনা বলা ঠিক হচ্ছে না। আসলে একটা ছবি। ছবিটাই ঘটনা। একটা আলোকচিত্র। ছবিটা আমি পকেটে করে এনেছি। একটা পেপার কাটিং। কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকা* থেকে কাটিং করেছি। ঢাকায় *আনন্দবাজার* একটা জায়গাতেই পাওয়া যায়। ধানমন্ডি দুইয়ে ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারে। সেখানে রিডিং টেবিলে বসে কাঁচি দিয়ে কেটে পকেটে ভরেছি। কেউ দেখেনি।

এই যে ছবিটা আপনার টেবিলে বিছিয়ে দিলাম। একটু দেখুন। কী দেখছেন? একটা লোক বসে আছে। তার চারপাশে বইপত্রের স্তূপ। লোকটার নাম কেশবন। বি এস কেশবন। দক্ষিণ ভারতের লোক। বোঝাই যাচ্ছে জায়গাটা একটা লাইব্রেরি। গ্রন্থাগার। আর কেশবন এটার লাইব্রেরিয়ান। কেশবন ভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগারিক। ছবিতে তাঁকে গালে একটা হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। একটু যেন বিমর্ষ। চারপাশের স্তূপ করে রাখা বইগুলো তিনি দুই ভাগে ভাগ করছেন। কেন ভাগ করছেন? কারণ দেশ ভাগ হচ্ছে। তারিখটা লক্ষ করুন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস। এক মাস পরেই ইংরেজরা চলে যাবে। সবকিছু পাকাপাকি হয়ে গেছে। ভারত উপনিবেশ ভাগের প্রস্তুতি চলছে। যেখানে যা কিছু আছে, দুই ভাগ। হিসাব-কিতাব চলছে। কেশবন তার লাইব্রেরির বইপত্রও দুই ভাগ করছেন। ছবিতে দেখুন, এক পাশের বইয়ের ওপর প্ল্যাকার্ডে রোমান হরফে লেখা 'পাকিস্তান'। আরেক ভাগে 'ইন্ডিয়া'।

ছবিটা তুলেছেন ডেভিড ডগলাস ডানকান নামে এক ব্রিটিশ সাংবাদিক। ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট আমেরিকার *লাইফ* ম্যাগাজিনে প্রথম ছাপা হয় এটা। পঞ্চাশ বছর পর ১৯৯৭ সালের আগস্টে *টাইম* ম্যাগাজিনে আবার ছাপা হয় এই ছবি। একেবারে প্রচ্ছদে। ভারত ভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তারা প্রচ্ছদ কাহিনি করেছিল। আগে-পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ছবিটা ছাপা হয়েছে।

দেশভাগের গ্রাউন্ড রিয়েলিটি ফুটে উঠেছে সামান্য একটা ছবিতে। বিখ্যাত ছবি। আইকনিক ছবি। কিন্তু ছবিটা খুবই কনফিউজিং। রহস্য দেখা দিয়েছে ছবিটার লোকেশন নিয়ে। কেশবন লাইব্রেরির বই ভাগ করছেন। কিন্তু কোন লাইব্রেরির বই?

লাইফ ম্যাগাজিনসহ প্রথম দিককার পত্রপত্রিকায় লেখা হলো, জায়গাটা দিল্লির ইমপেরিয়াল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি। কেশবন সেটারই লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন বাদে নব্বইয়ের দশকের পর থেকে কলকাতার ম্যাগাজিনগুলো দাবি করতে শুরু করল, জায়গাটা আসলে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি। কেশবন ওই সময় নাকি ছিলেন ওই লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। নানান তথ্য-প্রমাণ দিয়ে এই দাবি তোলা হলো। সেসব তথ্যপ্রমাণ এত অকাট্য, অস্বীকার করার জো নেই। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আমি *আনন্দবাজার* থেকে কেটে এনেছি যে ছবিটা, সেটার ক্যাপশনেও দেখুন একই কথা দাবি করা হয়েছে।

তাহলে একটা ছবি। একটা ঘটনা। কিন্তু সেটার লোকেশন দুটা। প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব। অথচ একটা দৃশ্যের তো একটাই লোকেশন হবে, তা-ই না? দুটো লোকেশন তো হতে পারে না।

এই ছবির রহস্য ভেদ করতে নেমেছিলেন আনহাদ হুনদাল নামে এক ভারতীয় সাংবাদিক। ছবিটা নিয়ে নানান জনের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে শুরু করেন তিনি। এঁকে দেখান, তাঁকে দেখান। কেউ কিছু জানেন কিনা, জিজ্ঞেস করেন। এভাবে একদিন তিনি গেলেন অন্বেষা সেনগুপ্ত নামে এক মহিলার কাছে। অন্বেষা দেশভাগ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। ছবি দেখে অন্বেষা বললেন, দেশভাগের সময় নানান কিছুই ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়েছিল বটে। কোনো সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ভাগ হয়নি। প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু কোনো পক্ষই সম্মত হয়নি। ফলে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিই হোক, আর হোক দিল্লির ইমপেরিয়াল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি, কোনোটাতেই এই দৃশ্যের অবতারণা হয়নি।

তাহলে বই ভাগাভাগির ছবিটা এল কোথা থেকে? এর জবাব দিতে পারবেন দুজন। এক, যিনি ছবিটা তুলেছেন, মানে ডেভিড ডগলাস ডানকান। দুই, যিনি ছবির বিষয়বস্তু, মানে কেশবন। ডগলাস কবে মরে ভূত হয়ে গেছেন! কেশবন এখনো বেঁচে আছেন বটে, কিন্তু স্মৃতি এমন ক্ষয়ে গেছে, ভরসা করা কঠিন। তবু নয়াদিল্লির এক শহরতলিতে তাঁর নিরিবিলি বাগানবাড়িতে গিয়ে অশীতিপর লাইব্রেরিয়ানের চোখের সামনে মেলে ধরা হলো ছবিটা। বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে কেশবন ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'লোকটা আমিই বটে। কিন্তু ঘটনাটা কখনো ঘটেনি।'

কোন ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করছেন কেশবন? লাইব্রেরি ভাগ হওয়াটা? না, মোটেও তা নয়। কেশবনের ছেলে মুকুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেশবন বললেন, 'বাবা বোঝাতে চাচ্ছেন, দেশভাগের ঘটনাটাই আসলে ঘটেনি।'

মানে? মানে হলো, ভারত ভাগ হয়েছে—এটাই কেশবন বিশ্বাস করেন না। আজীবন করেননি। তিনি বরাবর মনে করে এসেছেন, একটা অখণ্ড ভারতে তিনি বসবাস করছেন। ইংরেজরা চলে গেছে বটে, তবে র‍্যাডক্লিফের মানচিত্রটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। ওটার আর দরকার হয়নি। শেষ মুহূর্তে মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস লিডারদের মধ্যে একটা রফা হয়েছিল। জিন্নাহকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল। তাতে কলকাতার দাঙ্গাও আর হয়নি। লাহোরেও কাউকে কচুকাটা করা হয়নি।

একটা লোকের পক্ষে সারা জীবন এ রকম বিরাট এক বিভ্রান্তির মধ্যে বসবাস করা কী করে সম্ভব, আমার মাথায় ঢোকে না। এটা স্রেফ পাগলামি। কিন্তু কেশবনের এই ছবিটার ব্যাখা কে দেবে? ছবিটা একটা বিরাট খটকাই থেকে গেল।

ভাবছেন এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা কেন বলছি আপনাকে? আপনার সঙ্গে এগুলোর কী যোগ? আরেকটু ধৈর্য ধরুন। কিংবা এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তার ওই পারে একটা হোটেল আছে। মালাই দেওয়া চা বানায়। ফ্লাস্ক হাতে কাউকে যদি পাঠিয়ে দিতেন। এক কাপ চা হলে মন্দ হতো না।

এবার বর্তমান সময়ে আসি। তিন বছর আগের কথা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দুটি দৈনিক পত্রিকায় দুটি খবর ছাপা হলো। খুব মামুলি খবর। এক মন্ত্রীর খবর। আমি তাঁর নাম বলছি না। একটি খবরে বলা হলো, মন্ত্রী নেত্রকোনায় একটা সেতু উদ্বোধন করেছেন। আরেকটি খবরে বলা হলো, মন্ত্রী খুলনায় পার্টির একটি সভায় যোগ দিয়েছেন। দিতেই পারেন। মন্ত্রীরা এসব কাজই তো করবেন। সমস্যা হলো, পত্রিকা দুটি একই দিনে ছাপা হওয়া। এবং দুটি পত্রিকাই দাবি করছে, ছাপা হওয়ার আগের দিন মন্ত্রী এ কাজটি করেছেন। মানে একই দিনে। শুধু যে একই দিনে, তা-ই নয়, একই সময়ে—বিকেলবেলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি জায়গা লক্ষ করুন, একটা নেত্রকোনা, আরেকটা খুলনা। কীভাবে এটা সম্ভব হলো? হয় পত্রিকা দুটির কোনো একটি তারিখে ভুল করেছে। অথবা মন্ত্রী এক জায়গায় কাজ সেরে আসলেই আরেক জায়গায় গিয়েছেন। সমস্যা হলো, বাংলাদেশে নেত্রকোনায় বিকেলবেলা একটি সেতু উদ্বোধন করে বিকেলবেলাতেই খুলনায় গিয়ে পার্টির সভা করা সম্ভব নয়। বিমানে বা হেলিকপ্টারে করে গেলেও না। তার মানে পত্রিকা দুটির কোনো একটা ভুল নিউজ করেছে। না, পত্রিকা দুটির কোনোটিই ভুল নিউজ করেনি। আমি দুটি পত্রিকা অফিসে গিয়েছি। শুধু পত্রিকা অফিস নয়, নেত্রকোনা এবং খুলনাতেও গিয়েছি। মন্ত্রী আসলেই পত্রিকায় উল্লিখিত দিনে ওখানে গিয়েছিলেন। ওই সব কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিয়েছেন।

মন্ত্রী আমাদের এলাকার লোক। একে-ওকে ধরে আমি একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। পত্রিকার কাটিং তুলে দিলাম তাঁর হাতে। তিনি দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছু বললেন না।

চা-টা এরা ভালোই বানিয়েছে। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। বৃষ্টি কমে এসেছে। আমিও উঠব। আরেকটা ঘটনা বলেই আমি শেষ করব। তারপর আসল কথায় আসব।

এবার যেটা বলব, সেটার সঙ্গে আমি নিজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আমি একটা সরকারি দপ্তরে ছোটখাটো পদে চাকরি করি। দপ্তরটা তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে। তো ফিল্ম সেন্সর বোর্ডেও কিছুদিন কাজ করতে হয়েছে আমাকে। সেন্সর বোর্ড কী করে, জানেন তো? যারা ছবি বানায়, চলচ্চিত্র, তারা একটা করে কপি জমা দেয়। সেন্সর বোর্ড সেটা স্ক্রিনিং করে। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে ছবি দেখে। তারপর আলাদাভাবে রিপোর্ট করে। কোথাও কোনো আপত্তি আছে কি না, সরকারি গাইডলাইন ঠিকমতো মানা হয়েছে কি না—এসব বিষয়ে রিপোর্ট। আমার কাজ ছিল এসব রিপোর্ট কম্পাইল করা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপারিশগুলোর একটা তালিকা করে সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া। নব্বইয়ের দশকে আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের খুব দুর্দিন যাচ্ছিল, মনে আছে? অশ্লীলতাবিরোধী আন্দোলনের কারণে খুব মন্দা। বছরে দশ-বারোটি ছবিও বানানো হয় কি হয় না। সেন্সর বোর্ডে কাজ নেই। বোর্ড মেম্বাররা কালেভদ্রে একত্রে বসে ছবি দেখার সুযোগ পান। এ রকম সময়ে একদিন তরুণ এক চলচ্চিত্র নির্মাতার একটা ছবি জমা পড়ল। লোকটা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে ছবিটা তৈরি করেছেন।

সেন্সর বোর্ডে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কাজ পাওয়া গেছে। একদিন সন্ধ্যার পরপর ইস্কাটন গার্ডেন রোডে সেন্সর বোর্ডের অফিসে ফিল্ম স্ক্রিনিংয়ের বন্দোবস্ত হলো। আমিও তাতে উপস্থিত ছিলাম। সদস্য না হয়েও। ছবির কাহিনি বেশ জটিল। আর্ট ফিল্ম বলতে পারেন। বিষয়বস্তু এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের টানাপোড়েন। বিশ্বজুড়ে বামধারার রাজনীতির বিদায়ঘণ্টা বাজছে। নানান অস্তিত্ববাদী ক্রাইসিস। এ নিয়ে জটিল কাসুন্দি। ছবির প্রায় কিছুই বুঝলাম না। সমাপ্তিটা তো মাথার ওপর দিয়ে গেল।

এ রকম সিনেমা ঢাকার হলগুলোয় চলবে না। এগুলো ফেস্টিভ্যালে দেওয়ার জন্য। পুরস্কার-টুরস্কার পাবে। পত্রপত্রিকায় উচ্ছ্বসিত রিভিউ হবে।

ছবি শেষে বোর্ড মেম্বাররা গম্ভীর মুখে চলে গেলেন। তিন দিনের মধ্যে সবাই নিজ নিজ রিপোর্ট জমা দিলেন। সেগুলো সবই আমার টেবিলে এল। দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসেবে আমাকে সেগুলো পড়তে হলো। পড়তে পড়তে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। রিপোর্টগুলো পড়ে বোঝার উপায় নেই, দশ বোর্ড মেম্বার আসলে একটি অভিন্ন ছবি দেখেছেন। দেখলাম, তারা আসলে দশটি আলাদা আলাদা ছবির কথা বলছেন। একেক জনের ছবি শেষ হয়েছে একেকভাবে। যেমন একজন বললেন, তাঁর আপত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবিটির অহেতুক বিয়োগান্তক সমাপ্তি নিয়ে। ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রধান চরিত্রের মৃত্যু অপ্রাসঙ্গিক। এটা দর্শকদের মধ্যে ভুল মেসেজ দেবে। কিন্তু আমি অবাক হলাম এটা ভেবে যে, ছবিতে তো প্রধান চরিত্রের মৃত্যুই হয়নি। ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর কোনো দৃশ্যই কোথাও নেই। এভাবে একেকটা রিভিউ রিপোর্ট পড়ছি, আর আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

তাই বলে ভাববেন না, আমার জীবনে এই ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম। বলতে কি, অনেক ছোটবেলা থেকে আমি এ রকম অসংগতি দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আমি লক্ষ করেছি, জগতে এ রকম অসংগতির ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে। একটা ঘটনা দু-টুকরো হয়ে দুটি ঘটনায় পরিণত হয়। একটা লোক একই সময়ে দুই জায়গায় অবস্থান করে। খুব অল্প সময়ের জন্য করে। অধিকাংশ লোকেরই এগুলো নজর এড়িয়ে যায়। তবে কারও কারও চোখে পড়ে। তারা এটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না। চেপে যায়।

আমি চেপে গেলাম না। এ রকম ঘটনা আমি অনুসন্ধান শুরু করলাম। কড়া নজর রাখা। দেখলাম, যতটা বিরল ভেবেছিলাম, ততটা বিরল নয় এসব ঘটনা। সতর্ক থাকলে চোখে পড়ে। মাঝে মাঝেই পড়ে।

ব্যাখ্যা? না কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই। তবে এটুকু বুঝি, আমরা যতটা সরল মনে করি, জগৎটা তত সরল নয়। যেটাকে আমরা বাস্তবতা বলি, সেটা একটা বিছিয়ে রাখা চাদরের মতো। যুক্তির চাদর। কিন্তু সমস্যা কী জানেন, চাদরটার এখানে-সেখানে ছেঁড়াফাটা, কোথাও কোথাও সেলাই খুলে যাওয়া, কোথাও তাপ্পি মারা। ওই ছেঁড়া ফুটোগুলো দিয়ে আরেকটা জগৎ উঁকি দেয়। সূক্ষ্ম একটা আভাস পাওয়া যায়, বাস্তবতার এই চাদরের নিচে আরেকটা বৃহত্তর জমিন আছে। সেখানে দুইয়ে দুইয়ে সব সময় চার হয় না। সেখানে লজিক চলে তার নিজের নিয়মে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে অদ্ভুত কথা কী জানেন, এই বিশেষ ধরনের ঘটনা, এইসব অসংগতি খুঁজতে খুঁজতে আমি এগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটা প্যাটার্ন আবিষ্কার করতে শুরু করলাম। ব্যাখ্যা করতে পারব না, কিন্তু এটা ঠিক যে আমি আগাম আভাস পাই। আমি প্রেডিক্ট করতে পারি। টের পাই, কখন এ রকম ঘটনা আবার ঘটতে যাচ্ছে। এটা আমার একটা বাড়তি ক্ষমতাই বলতে পারেন। আমি আগাম বুঝতে পারি, চাদরটার কোথায় কোথায় ছেঁড়া।

আপনি যে বিরক্ত হচ্ছেন সেটা স্পষ্ট। হবেনই-বা না কেন! এতক্ষণ ধরে বকবক করছি। এভারেস্টের চূড়ার একটা পাথরখণ্ড, দেশভাগের সময়কার একটা লাইব্রেরি ভাগের ছবি, সেন্সর বোর্ডের সিনেমা নিয়ে গ্যাঞ্জাম—এসব হাবিজাবি কথা এ রকম বৃষ্টির দুপুরে মোহাম্মদপুর থানার ওসিকে বলার কী মানে? আপনি যে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনেছেন, এটাই অবাক বিষয়। আপনার ঘড়িতে এখন কটা বাজে? দুপুর দুটা সাঁইত্রিশ মিনিট, তাই তো? বেশ। এবার তাহলে কাজের কথায় আসি। আমি এসেছি একটা জিডি করতে। আপনি আমার নামে একটা জিডি রেকর্ড করবেন। হ্যাঁ, এখন। কী লিখবেন? লিখুন, একটা লোক আমাকে হুমকি দিচ্ছে। লোকটাকে আমি চিনি না। নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। টেলিফোনে দিচ্ছে, রাস্তায় দেখা করে দিচ্ছে। বলছে, আমাকে মেরে ফেলবে। লিখছেন? জিডি করার সময়টা ভালো করে লিখুন। দুইটা সাঁইত্রিশ মিনিট। পারলে সেকেন্ডটাও লিখুন। এবার কি সই দিতে হবে আমাকে? দিচ্ছি। এবার তাহলে উঠি। জানতে চান এসবের মানে কী? কেন এত বকবক করলাম? আরে, আমি তো ভেবেছিলাম আপনার কৌতূহল বলে কিছুই নেই। এতক্ষণ যেভাবে মুখ গোমড়া করে ফোনে গেম খেলছিলেন, ভেবেছি আপনি কিছুই শোনেননি। শুনুন, আপনাকে খোলাসা করেই বলি। আপনাকে বলাই যায়। ইনফ্যাক্ট আপনাকে বলাই ভালো। জিডির অভিযোগের তদন্ত করাটা আমার জন্য খুব দরকারি না। দরকারি হলো জিডি করাটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাই আমার অ্যালিবাই। আমার দরকার এটা প্রমাণ করা যে এই দুপুর দুইটা সাঁইত্রিশ মিনিটে আমি মোহাম্মদপুর থানায় বসে ছিলাম একেবারে ওসি সাহেবের সামনে। একবারও নড়িনি। কোথাও যাইনি। কারণ কী? কারণ, ঠিক এই মুহূর্তে এই দুটা সাঁইত্রিশ মিনিটে বনানী এগারো নম্বর রোডে একটা প্রাইভেট ব্যাংকে ডাকাতি হচ্ছে। ছয়জন ডাকাত ভয়ানক অস্ত্র তাক করে সবাইকে জিম্মি করে ভল্টের টাকাপয়সা সব নিয়ে যাচ্ছে। আজই সন্ধ্যাবেলা এটা নিয়ে থানায় মামলা হবে। আজ রাত থেকেই তদন্ত শুরু হবে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ছয় ডাকাতের দুজনকে চেনা যাবে। তাদের একজন আমি। হ্যাঁ, আমি। কোনো ভুল নেই। এই আমিই—তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক ক্লার্ক। কীভাবে সেটা সম্ভব, এতক্ষণ ধরে সেটাই তো বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনাকে।

আমার এখন একটাই ভরসা। আপনি। আপনার সাক্ষ্য। আর এই জিডি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. মারদ্রুসের বাগান

ড. মারদ্রুসের বাগান নিয়ে কত যে গল্প শুনেছি। লোকমুখে রটতে রটতে সেসব গল্প বিচিত্র ডালপালা ছড়িয়েছে। কত মিথ, কত কিংবদন্তি।

ড. মারদ্রুসের বাগান নাকি রাতের বেলা জেগে ওঠে। প্রতিটি পাতা, ফুল-ফল থেকে আলোর আভা বের হয়। বাতাস বয়ে গেলে এই বাগান এমন করে ফিসফিস করে ওঠে, যেন জগতের সব গুপ্তকথা ফাঁস করে দিচ্ছে। এই বাগান জীবন্ত।

এখন দোতলার জানালা দিয়ে আমি সেই বাগানের দিকে তাকিয়ে আছি। সবই গুজব বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার এ-ও টের পাচ্ছি, জানালাপথে চোখের সামনে জেগে ওঠা এই বাগিচা খুব চেনা কিছুও নয়। জগতের কোনো বাগান এ রকম হতে পারে না। দূর থেকে গাছগুলো পরিচিত লাগছে বটে, তবে ভালো করে তাকালে বোঝা যায়, একটি গাছও চেনা নয়। খুবই অনিয়মিত সেগুলোর পত্রবিন্যাস, কাণ্ড থেকে ডালপালা বেরিয়ে আসার ক্রমের মধ্যে কোনো সংগতি নেই। ফুলগুলো যেভাবে পাপড়ি ছড়িয়েছে, তাতে নেই কোনো প্রতিসাম্য। তা ছাড়া মাটি থেকে কাণ্ডগুলো এমন অপরিচিত ভঙ্গিতে পেঁচিয়ে বেরিয়ে এসেছে, দেখতে অস্বস্তি লাগে।

একর দেড়েক জমিতে বিশাল এক উদ্যান। সবুজ ঘাসের গালিচায় পাথর ফেলে পায়ে চলা পথ বানানো হয়েছে। দুপাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধচেনা গাছের ফাঁকে কিছু গুল্মও আছে। বাগানের মাঝামাঝি একটা অর্কিডের শেড। এখানে-সেখানে মর্মর পাথরের ফোয়ারা, কাঠের বেঞ্চ। প্রাচীন কোনো প্রাসাদ-উদ্যান বলে ভুল হয়। এক কোনায় একটা গ্রিনহাউসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, গাছের ডালপালায় ভালো করে চোখ পড়ে না।

তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি, কেন এই বাগান একটা নিষিদ্ধ জগৎ, কেন বাইরের বিশ্বের কাছ থেকে এটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

'কারণ এই বাগানের টিকে থাকা না-থাকার ওপর নির্ভর করছে গোটা মানবজাতির অস্তিত্ব। এটাই আমাদের সভ্যতার প্রাণভোমরা,' ড. মারদ্রুস বললেন। তিনি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি।

আমি চমকে ফিরে তাকাই। আমার চিন্তা হয়তো চেহারায় অনেকটাই ফুটে উঠেছে।

'কীভাবে? একটা সামান্য বাগান কী করে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে?'

'এটা কোনো সামান্য বাগান নয়। আসুন ঘুরে দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন।'

একটা আপেলগাছের নিচে বেঞ্চে আমরা দুজন বসেছি। আমি আর ড. মারদ্রুস।

আপেলগাছ বললাম বটে, তবে বলা উচিত, আপেলগাছের মতো দেখতে একটা গাছ। খুব বড় গাছ নয়। ডালগুলো নুয়ে পড়া। তাতে যেসব ফল ধরে আছে, দেখতে আপেলের মতোই।

'কী গাছ এটা, বলতে পারেন?'

'আপেল।'

'কোন জাতের আপেল? গ্যালা, ফুজি নাকি গ্র্যানি স্মিথ?'

'আমি আপেলের জাত চিনি না।'

ড. মারদ্রুস বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান। হাত বাড়িয়ে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপেল ছিঁড়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেন। একটা লাল গোলাকার পুরুষ্টু আপেল।

'নিন। খেয়ে দেখুন। এটা আসলে রেড ডেলিশাস। খেয়ে স্বাদটা কেমন বলবেন।'

ড. মারদ্রুসের বাড়িয়ে ধরা হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে এক মুহূর্ত স্নোহোয়াইটের সেই বিখ্যাত দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল।

'নিন। চেখে দেখুন। ভয়ের কিছু নেই। এতে বিষ মেশানো নেই।'

আমি আপেলটা হাতে নিয়ে বসে থাকলাম। কামড় বসালাম না। ড. মারদ্রুস আমার কাণ্ড দেখে একটু হাসলেন। বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে।

'এক হিসেবে আপনার এই অস্বস্তি খুব অমূলক নয়। যে জিনিসটা আপনি হাতে ধরে আছেন, সেটা বাইরে থেকে দেখতে আপেলের মতো বটে। কিন্তু এটা আপেল নয়। বলতে কি, এটা আসলে কোনো ফলই নয়।'

'তাহলে এটা কী?'

'বললে বিশ্বাস করবেন? এটা শেক্সপিয়ারের একটা সনেট।'

'মানে?'

'হ্যাঁ, শেক্সপিয়ারের সনেট। একটা নয়, শেক্সপিয়ারের সবগুলো সনেট। শুধু সনেট না, এটা শেক্সপিয়ারের সব ট্র্যাজেডি ও কমেডি এবং এলিজাবেথান পিরিয়ডে লেখা সব নাটক, ওই সময়ের সব চিঠি এবং এমনকি জমি-জায়গা কেনাবেচা-সংক্রান্ত সব দলিল-দস্তাবেজ।'

আমি অবাক হয়ে মারদ্রুসের দিকে তাকালাম।

'আর ওই যে ওখানে নিমগাছটা দেখছেন, ওটা সংস্কৃত কবি কালিদাসের লেখা সবগুলো কাব্য নাটক— *কুমারসম্ভব*, *শকুন্তলা*, *মেঘদূতম*। বাতাসে নিমের পাতাগুলো কীভাবে কাঁপছে দেখুন। মন্দাক্রান্তা ছন্দে কাঁপছে বলে মনে হচ্ছে না?'

লোকটা পাগল নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মুখের ভঙ্গি দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন মারড্রুস।

'বুঝিয়ে বলব। আপনি এই বাগানের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। একদিক থেকে দেখলে আপনি হবেন এটার মালি। প্রতিদিন গাছগুলোর যত্ন নেবেন আপনি, পানি দেবেন, সার দেবেন, আগাছা ছেঁটে দেবেন, কলম করবেন, বীজ সংগ্রহ করবেন। ফলে আপনাকে বুঝিয়েই তো বলতে হবে।'

'যতই বুঝিয়ে বলুন, একটা আপেলের শেক্সপিয়ারের সনেট হয়ে ওঠার গল্প কোনো দিনই আমার কাছে বোধগম্য হবে না।'

'আপেল তো শেক্সপিয়ারের সনেট হয়নি। বরং শেক্সপিয়ারের সনেটই আপেল হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা খুব সরল। আপনি একজন বোটানিস্ট। জেনেটিক্স পড়া আছে আপনার। ফলে আপনি আরও সহজে বুঝতে পারবেন।'

ড. মারড্রুস একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ঘণ্টা তিনেকের একটা ক্লাস লেকচার বলা যায়। তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কেউ একজন একে একে বাগানের গ্যাসবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আমি অনড় হয়ে বসে থাকলাম আপেলরূপী সনেটগাছের তলায়। যা শুনলাম, তা এখনো ঠিকমতো হজম হচ্ছে না। তবু ওই বক্তৃতার একটা সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরছি।

'উইকিপিডিয়া সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে আপনার? সারা বিশ্বের শতসহস্র ভলান্টিয়ার মিলে একটু একটু করে গড়ে তুলছে বিশাল এক অনলাইন জ্ঞানভান্ডার। উন্মুক্ত। অসীম। যে কেউ চাইলেই এটায় নতুন ভুক্তি যোগ করতে পারে, পুরোনো ভুক্তি সম্পাদনা করতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল যুগের এনসাইক্লোপিডিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে হবে, এটা অসীমসংখ্যক ভলিউমের, অসীমসংখ্যক পৃষ্ঠার এক মহাগ্রন্থ। সমস্যা হলো, অসীম হলেও এটা অনন্তকালের নয়। উইকিপিডিয়া স্বল্পায়ু নিয়ে জন্মেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উইকিপিডিয়া কাগজে প্রিন্ট দিয়ে বই আকারে বের করার একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল কিছুদিন আগে। যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁরা শিগগিরই টের পেলেন, এটা অসম্ভব একটা কাজ। পুরো প্রকল্প দেউলিয়া হয়ে যাবে, তবু প্রিন্ট দেওয়া শেষ হবে না। এ মুহূর্তের কথাই ধরুন। উইকিপিডিয়ায় এখন ৪ কোটি আর্টিকেল আছে, ২২৯টি ভাষায়। আর প্রতি মুহূর্তে সেটা হু হু করে বাড়ছে। গত বছর ফরাসি ভলান্টিয়াররা তর্ক তুলেছেন, রেসিপি বা রন্ধনশৈলী কেন উইকিপিডিয়ার আর্টিকেলভুক্ত হবে না। মানে ব্যাপার হলো, দুনিয়ার যেকোনো কিছু উইকিপিডিয়ার বিষয় হতে পারে।

'কাগজের পৃষ্ঠায় উইকিপিডিয়া প্রিন্ট দিয়ে রাখার প্রকল্প বাতিল হয়ে গেছে। আর এইখানেই মূল বিপদটা লুকানো। সংরক্ষণের বিপদ। উদ্যোক্তারা টের পেতে শুরু করলেন, উইকিপিডিয়া ক্রমশ বাড়তে থাকা এমন এক জ্ঞানভান্ডার, যেটা ডিজিটাল ফরম্যাটে ছাড়া অন্য কোনো ফরম্যাটে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। তার মানে এই ফরম্যাটের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করছে পুরো উইকিপিডিয়ার অস্তিত্ব।

'ডিজিটাল জগতে তথ্য কীভাবে সংরক্ষিত হয়? তা কতটা সুরক্ষিত? আপনি বিশাল বিশাল সব সার্ভারে উইকিপিডিয়া কপি করে রাখছেন। কিন্তু সেই সার্ভারগুলো রাখছেন কোথায়? ধরা যাক, এক বিশাল ভূমিকম্পে একসঙ্গে সব সার্ভার ধ্বংস হয়ে গেল? পরদিন আপনি যে পৃথিবীতে জেগে উঠবেন, সেখানে কোনো উইকিপিডিয়া থাকবে না। শুধু উইকিপিডিয়া কেন, কোনো এনসাইক্লোপিডিয়াই থাকবে না। কারণ উইকিপিডিয়া অন্য সব ফিজিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়াকে আগেই বিদায় করে দিয়েছে।

'উইকিপিডিয়া কর্তৃপক্ষ কিছুদিন ধরেই ভাবছে, কিছু সার্ভার তারা চাঁদের পিঠে নিয়ে গিয়ে সেখানে মাটির তলায় পুঁতে রাখবে। পৃথিবী যত বড় দুর্যোগেই পড়ুক, চাঁদে লুকানো স্টোরেজ থেকে ডাউনলোড করে নিলেই চলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও রকম কোনো একটা মহাদুর্যোগের কথা যদি বাদও দেন, আরেকটা বিপদ কিন্তু গোকুলে বাড়িছে। ডিজিটাল জগতের নিজস্ব চরিত্রের ভেতরেই সেটার জন্ম। ব্যাপারটা পদ্ধতিগত। লক্ষ করবেন, ডিজিটাল জগতে কোনো ফরম্যাটই চিরস্থায়ী নয়। ডেটা স্টোরেজ ব্যবস্থার কথাই ধরুন। ফ্লপি ডিস্কের জগৎ কীভাবে চোখের পলকে মিলিয়ে গেল! সিডি ডিস্ক আজ কোথায়! আপনি নিশ্চিন্তে ডেটা স্টোর করে রাখছেন। কিন্তু যে ফরম্যাটে সেটা রাখছেন, সেই ফরম্যাট রিড করার যন্ত্রই ধরুন আর থাকল না। তখন ভূমিকম্প হওয়া না-হওয়া একই কথা।

'কোনো ডিজিটাল স্টোরেজ সিস্টেমই খুব দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিছুদিন ফেলে রাখলে ওটা মৃত্যুঘুমে তলিয়ে যায়। আর জাগতে চায় না।

'আমি উইকিপিডিয়ার প্রসঙ্গটা তুলেছি একটা উদাহরণ হিসেবে, আমাদের কালে জ্ঞান ও তথ্য উৎপাদন এবং সংরক্ষণের বৃহত্তর ছবিটা বুঝতে যাতে সুবিধা হয়। তথ্য বা জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বয়ে নেওয়ার এই সংকট মানবসভ্যতাকে চিরকালই ভুগিয়েছে। সম্রাট অশোকের মতো পাথরের গায়ে খোদাই করে আপনি অনুশাসন লিখে রাখতে পারেন বটে, কিন্তু জগতের সব পাহাড়ের গা সয়লাব করে ফেললেও আপনি এক টেরাবাইট তথ্যও উৎকীর্ণ করতে পারবেন না। সমকালীন জ্ঞান সমকালেই হারিয়ে যায়। গ্রিক পণ্ডিতদের কথা চিন্তা করুন। অজস্র পণ্ডিত গিজগিজ করত। তাঁদের কার লেখা আজ আর টিকে আছে? আমরা শুধু অন্যের অনুবাদ ও রেফারেন্স থেকে তাঁদের কথা জানি। মধ্যযুগের মুসলিম পণ্ডিতেরা আরবি ভাষায় অনুবাদ করে না দিলে আজ অ্যারিস্টটল কোথায় থাকতেন? লাতিন সাহিত্যের কথাই ধরুন। বিপুলসংখ্যক নারী সাহিত্যিক ছিলেন রোমান যুগে। একজনের লেখাও আজ টিকে নেই। মধ্যযুগের সাহিত্যের শুধু সেগুলোই টিকেছে, যেগুলো কেউ হাতে লিখে কপি করেছে। আমরা জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন এবং কারা পিরামিড বানিয়েছিল। কিন্তু আমরা কি জানি, প্রাচীন মিসরীরা কীভাবে দুপুরের খাবার রান্না করত? কতটা লবণ দিত ডালে? মিসরীয় বাদ্যযন্ত্রের চেহারা আমরা দেখেছি। কিন্তু ওইসব যন্ত্রে বাজানো সুরের নোটেশন কি টিকে থেকেছে? থাকেনি। হারিয়ে গেছে।

'মানুষের সভ্যতা আসলে তার লব্ধ জ্ঞানের যোগফল ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ সমস্যা হলো, মানুষের স্মৃতিকোষ ডেটা স্টোরেজের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম নয়। মানুষ চিরকালই তার সামগ্রিক স্মৃতি ও জ্ঞানরাশিকে জমিয়ে রেখেছে তার মগজের বাইরে, কোনো ভৌত কাঠামোর মধ্যে। রাক্ষস যেভাবে তার প্রাণ লুকিয়ে রাখে ভোমরার মধ্যে। জগতের সব লাইব্রেরির সব বই আজ পুড়িয়ে ফেলুন, আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগেই মানবসভ্যতা অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে।

'ডিজিটাল যুগে জ্ঞানভান্ডার আপনি কাগজের বইয়ের মধ্যে সীমিত রাখতে পারেননি। রাখা সম্ভব নয়। কারণ এই জ্ঞানভান্ডারের আকার প্রায় অসীমের কাছাকাছি। সেখানেই বিপদ। অসীম আর শূন্যের মধ্যে ভেদরেখা অতি সামান্য। মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ডিজিটাল প্রযুক্তির জোরে আপনি প্রায় অতিমানব হয়ে উঠেছেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে গুহামানব হয়ে পড়ার ঝুঁকিও ডেকে এনেছেন।

'রোমানরা ভাবত, তাদের সভ্যতা অক্ষয়। রোমান সম্রাটরা ভাবতেন, তাঁরা এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন, যা চিরকাল টিকে থাকবে। আমরাও একই রকম আত্মপ্রসাদে ভুগছি।

'প্রশ্নটা এক বা দুই দশক বা শতাব্দীর নয়। প্রশ্নটা হলো, বর্তমান ডিজিটাল জ্ঞানভান্ডারকে কী করে পরবর্তী দশ বা বিশ হাজার বছর পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যাবে। এমন নির্ভরযোগ্য ডেটা স্টোরেজ পদ্ধতি কোথায় মিলবে। এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আমার এই বাগানের যোগ আছে। কিংবা বলতে পারেন, এই বাগানই মানুষের সেই প্রশ্নের জবাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা একদল লোক বলতে চাইলাম, মানুষকে এই প্রশ্নের জবাব বাইরের দিকে না খুঁজে, খুঁজতে হবে ভেতরের দিকে। মধ্যযুগের সুফি-সাধকেরা যেভাবে মানুষের ভেতরেই অনন্ত জগৎ খুঁজতেন, আমরাও প্রায় সেভাবেই বললাম, প্রতিটি মানুষ নিজে সহস্র কোটি তথ্যের এক বিশাল ভান্ডার বয়ে নিয়ে চলেছে নিজের ভেতরে। বিবর্তনের পথে এই তথ্য লুকানো আছে তার জিনের মধ্যে, ডিএনএ বিন্যাস-কাঠামোয়। প্রকৃতির রাজ্যে ছয়টি বর্ণে লেখা হচ্ছে অনন্ত এক গ্রন্থ। অক্ষয় সেই কিতাব। আজও যদি আপনি বরফের নিচে চাপা পড়া প্রাচীন কোনো ম্যামথের মৃতদেহ খুঁজে পান, বা পেয়ে যান গাছের আঠার মধ্যে আটকে পড়া কোনো প্রাগৈতিহাসিক মশা, তাহলে সেটার পাকস্থলীর মধ্যে পাওয়া ডিএনএ থেকে আপনি ডাইনোসরদের ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কোটি কোটি বছরেও নষ্ট হয় না ডিএনএর কাঠামোর মধ্যে থাকা তথ্য-উপাত্ত।

'ডিজিটাল ডেটা সংরক্ষণের এই যে অভিনব প্রযুক্তি আমরা উদ্ভাবন করলাম, সেটার নাম দেওয়া হলো ডিএনএ স্টোরেজ। কৌশলটা খুব সহজ। ডিএনএর যে ছয়টা বেজ সিকোয়েন্স আছে, সেগুলো ব্যবহার করে কোড করা হয় তথ্য। তারপর এই ডিএনএ কাঠামোটিকে রেখে দিতে হয় একটা শীতল কোনো জায়গায়। পরে যখন খুশি চাইলেই এই ডিএনএর তথ্য রিট্রিভ করা যাবে ডিএনএ সিকোয়েন্সিং মেশিনের সাহায্যে।

'এই পদ্ধতির সুবিধা হলো, বিপুলসংখ্যক তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায় খুব অল্প জায়গার মধ্যে। ধরা যাক, এই মুহূর্তে বিশ্বের সব পারসোনাল কম্পিউটারে এবং সব সার্ভারে যা কিছু তথ্য আছে ডিজিটাল ফরম্যাটে, তা সবই যদি ডিএনএ সিকোয়েন্সিং করা যায়, তাহলে তা একটা ছোট্ট কাভার্ড ভ্যানের মধ্যে এঁটে যাবে।

'বছর বিশেক আগে আমরা দুনিয়ার সব তথ্য ডিএনএ স্টোরেজ করার প্রক্রিয়া শুরু করি—সব তথ্য—এফবিআইয়ের গোপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নথিপত্র থেকে শুরু করে মুদির দোকানের ফর্দ পর্যন্ত, সবকিছু। আর তা করতে করতে দ্বিতীয় একটা চিন্তা আমাদের মাথায় আসে। আমি বলব, চিন্তাটা আমারই মাথায় আসে প্রথম। আর আমার নেতৃত্বে শুরু হয় গোপন আরেকটা প্রকল্পের কাজ। আমাদের কথা হলো, একটা নির্জীব ফ্রিজারের মধ্যে এসব ডিএনএ সিকোয়েন্স সংরক্ষণ করে রাখার দরকার কী? তার চেয়ে প্রকৃতির নিজস্ব সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে কী সমস্যা? ভেবে দেখুন, প্রকৃতি কীভাবে তার নিজস্ব ডিএনএ বা জিন সিকোয়েন্স সংরক্ষণ করে? প্রকৃতি সেটা করে জীবদেহে। একটা জীবদেহ বা প্রাণিদেহ তো আসলে জিনের একটা বাহক বা ক্যারিয়ারমাত্র। আমি বলব, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ক্যারিয়ার। ফলে আমাদের যেটা করতে হবে, তা হলো ডিজিটাল কোডবাহী ডিএনএ বা জিনগুলোকে কোনো জীবদেহের জিনতন্ত্রের মধ্যে স্থাপিত করতে হবে। আমরা সেটা শুরু করি উদ্ভিদের মধ্যে। বিভিন্ন উদ্ভিদের জিনতন্ত্রের মধ্যে আমরা আমাদের কোডেড ডিএনএগুলো ইমপ্ল্যান্ট করতে শুরু করি। ওই উদ্ভিদ প্রজাতি যত দিন টিকে থাকবে, তত দিন টিকে থাকবে এসব কোডেড তথ্য। এইভাবে আমাদের তথ্যভান্ডার ফুলে-ফলে প্রকাশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই বাগানে। মানুষের জ্ঞান লালন-পালনের ভার প্রকৃতির হাতে তুলে দেওয়া হলো।

'কিন্তু এখানে একটা সমস্যা দেখা দিল। প্রকৃতি জিনের মধ্য দিয়ে তথ্য বহন করে বটে। কিন্তু প্রকৃতি সেই তথ্য অবিকৃত রাখে না। জিনের মিউটেশন হয়ে ক্রমাগত নতুন নতুন সিকোয়েন্স তৈরি হয়। ফলে এখানে এই বাগানে নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হতে শুরু করে। আমরা এটাকে বাধা দিইনি। চলুক না। তথ্যের সঙ্গে তথ্য মিশে, তথ্যের কী কী নতুন মিউটেশন দাঁড়ায়, সেটাও তো এক নতুন পরীক্ষা।

'বলতে পারেন, এই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের মানব-সভ্যতার পাশাপাশি প্যারালাল কী কী সভ্যতা হতে পারত, বা হতে পারে, সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফলে এ মুহূর্তে যে আপেলগাছের নিচে আপনি বসে আছেন, বলেছি যে সেটা আসলে শেক্সপিয়ারের সব সনেট, কিন্তু আদতে এত দিনে সেটা আর শেক্পিয়ারের সনেট নেই। বলা যেতে পারে, শেক্সপিয়ার যেসব সনেট লিখতে পারতেন, কিন্তু লেখেননি, এগুলো সেই সব সনেটে পরিণত হয়েছে।'

ড. মারড্রুস উঠে চলে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ আপেলগাছের নিচে বেঞ্চে বসে থাকলাম।

গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল যে লোকটা, তাকে আবার দেখতে পাচ্ছি। লোকটা একটা নষ্ট লন মোয়ার যন্ত্র সারাই করার চেষ্টা করছে। আমি তাকে ভালো করে লক্ষ করার চেষ্টা করলাম। কেননা ড. মারড্রুসের শেষ কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে।

'আপনাকে একটা কথা না জানিয়ে পারছি না। জগতের জ্ঞানভান্ডার উদ্ভিদের জিনতন্ত্রে ইমপ্ল্যান্টের মধ্যে আমরা এখন আর সীমাবদ্ধ নেই। চারপাশটা ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন। মোজার্টের গানের স্বরলিপি থেকে শুরু করে ওয়ালমার্টের শপিং লিস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য আপনার চারপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুযুগের ওপার হতে

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের দস্তগীর কমিটির প্রথম প্রতিবেদন কোনো দিন আলোর মুখ দেখবে না। শোনা যায়, ৭০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি এত অসংলগ্ন ছিল, বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ঘরভর্তি লোকজনের সামনে সেটি টেবিল থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। নতুন করে প্রস্তুত করা দ্বিতীয় প্রতিবেদন ১৩ দিন পর ঢাকায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। সেই প্রতিবেদন ৩৬ পৃষ্ঠায় নামিয়ে আনা হয়েছিল। তাতে তদন্ত কমিটির নেওয়া কয়েকটি সাক্ষাৎকার ও বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও ভাষ্য ছেঁটে ফেলে দেওয়া হয়। প্রথম প্রতিবেদনে ছিল, অথচ দ্বিতীয় প্রতিবেদনে স্থান পায়নি, এমন কয়েকজনের ভাষ্যের কিছু অংশ ও দুটি সাক্ষাৎকার এখানে তুলে ধরা হলো।

ভাষ্য ১
ফজলে ইকরাম চৌধুরী, সভাপতি
বাংলাদেশ মাস্টার স্টিভিডোরস অ্যাসোসিয়েশন

২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমি বন্দরের ৩ নম্বর কন্টেইনার জেটিতে গ্যান্ট্রি ক্রেন অপারেটর শামস মেহেদির সঙ্গে অলস গল্প করছিলাম। শামস মেহেদি আমাদের সাতক্ষীরা এলাকার ছেলে। আমার দেশি ভাই। বিএল কলেজের ছাত্র ছিল। আমার এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে আমি ঘটকালি করছিলাম। শামস মেহেদি ক্রেনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এ সময় মাঝেমধ্যে তার পকেটে রাখা ওয়াকিটকি বেজে উঠছিল। তাতে আমাদের গল্পে বিঘ্ন ঘটছিল না। কেননা কেউ আমরা সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছিলাম না।

গল্পের একপর্যায়ে শামস মেহেদির ওয়াকিটকিতে ভিটিএমআইএস রুমের মহসীন মোস্তফার কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে। মহসীন বন্দরের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্কবার্তা দিচ্ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত সতর্কবার্তা। বন্দরের জন্য অ্যালার্ট নম্বর ৪। বন্দরের বিপদসংকেতের মাপকাঠি আলাদা। এখানে চার নম্বর অ্যালার্ট মানেই মহাবিপদ সংকেত। এর চেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে না। ঘোষণা শুনে আমাদের ভ্রু কুঁচকে গিয়েছিল। আমি আর শামস মেহেদি অবাক হয়ে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

এ রকম আঁতকা আকাশ থেকে ঘূর্ণিঝড় পড়ে নাকি? দুপুরের দিকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে একটা ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্কসংকেত ঝুলিয়ে রাখা ছিল বটে, বন্দরের জন্য কোনো আলাদা সতর্কতাই ছিল না। কারণ সেপ্টেম্বরে সমুদ্রে এ রকম লঘুচাপ সপ্তাহে দু-তিনটা থাকেই। সেগুলো বিশেষ ধর্তব্যের নয়।

বলা নেই কওয়া নেই, এক লাফে অ্যালার্ট ফোর? মহসীনের কি মাথাটাথা খারাপ হলো নাকি!

ভাষ্য ২
মহসীন মোস্তফা, রেডিও কন্ট্রোল অপারেটর
চট্টগ্রাম বন্দর

২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমার ডিউটি তখন শেষের দিকে। উঠব উঠব করছি। লুবনা ম্যাডামের গাড়িতে আজ লিফট পাওয়া যাবে। কিন্তু শর্ত, সময়মতো বের হতে হবে। আমি টিফিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যারিয়ার গোছাচ্ছি, এমন সময় আবহাওয়া অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস থেকে কামরুল মোল্লা ল্যান্ডফোনে আমাকে ফোন করেন। আমার হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ার পড়ে যাওয়ার অবস্থা। ঠিক শুনছি তো? কামরুল আমাকে বলছেন, ৬ নম্বর বিপদসংকেত নদীবন্দরে। এখন, নদীবন্দর আর মাছ ধরার জাহাজের জন্য যেটা ৬ নম্বর বিপদ সংকেত, সমুদ্র বন্দরের জন্য সেটা অ্যালার্ট ৩। এর ওপর এক ধাপ উঠলেই অ্যালার্ট ৪।

আমি আমাদের ফ্লোর ইনচার্জ হার্বার মাস্টার আমিনুল ইসলামের টেবিলে ছুটে যাই। আমিনুল ইসলাম আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঢাকায় আবহাওয়া দপ্তরের কয়েকজনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। ক্রস চেক। তারপর আমাকে বললেন, মহসীন, ঘোষণা দাও। অ্যালার্ট ৩।

লুবনা ম্যাডামের গাড়ির ড্রাইভার আমার মোবাইলে বারবার ফোন দিচ্ছিল। তাঁদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি আমার টেবিলে মাইক্রোফোনের বাটন অন করি। ঘোষণা দিতে যাব, এই সময় আমার টেবিলের ল্যান্ডফোন বেজে ওঠে। আবহাওয়া অফিসের কামরুল আবার ফোন দিয়েছে। বলল, মহসীন ভাই, স্টপ। ভুল হইছে। ৬ নম্বর নয়, ৭ নম্বর মহাবিপদসংকেত।

তার মানে বন্দরের জন্য অ্যালার্ট ৪ ঘোষণা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

আমি ইংরেজিতে বললাম, হোলি শিট!

ঘোষণা দেওয়ার সময় বুঝতে পারছিলাম, আমার গলা কাঁপছে।

ভাষ্য ৩
মনজুর আকন্দ, থার্ড অফিসার, গ্লাডিয়েটর

সাগরে ২৩ দিনের মাছ ধরার সর্টি শেষে আমরা বন্দরে ফিরছি। আমাদের গ্লাডিয়েটর একটা মিড ওয়াটার ফিশিং ট্রলার। এবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩ দিন অনেক রিবন ফিশ আর পমফ্রেট ধরা পড়েছে। প্রচুর দাতিনা মাছও পেয়েছি। অল্প কিছু লবস্টার। ফ্রিজিং করে সেগুলো খোলে ভরে রাখা হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বহির্নোঙরের আলফা অ্যাংকরেজ এলাকা পেরিয়ে আমরা কর্ণফুলীর এসচুয়ারিতে ঢুকছি। আমাদের ডানে 'সেইন্ট ভ্যালিয়েন্ট' নামে সিঙ্গাপুরের একটি মাদার ভেসেল। যাওয়ার সময় এটাকে দেখে গিয়েছিলাম। ২৩ দিন ধরে পণ্য নিয়ে এটা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বন্দরের কাজের গতির নমুনা।

ব্রিজ রুমে রেডিও বার্তা আসছে। অপারেটরের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। অ্যালার্ট ফোর। রেডিওর শর্ট ওয়েভ স্টেশন থেকে বলা হচ্ছে, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে সাড়ে চার শ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে, যেটার পরিধির বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটারের বেশি। একটা বিশাল চাকা যেন বন বন করে ঘুরছে। আমি ব্রিজরুমে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সাগরের পানি পুকুরের মতো শান্ত। ঝড়ের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে গেছে। পুরো সাগর লাল হয়ে আছে।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, সমুদ্র আজ একটু যেন বেশিই লাল। এত লাল আগে দেখিনি।

ভাষ্য ৪
নাথানেল সেরভেন্তো, ক্যাপ্টেন, এল এসপেকতাদোর

ব্রাজিল থেকে তিন হাজার টন গম নিয়ে এসেছিল আমাদের জাহাজ এল এসপেকতাদোর। ১৫ দিন আউটার অ্যাংকরেজ চার্লিতে অপেক্ষা করার পর আমরা বন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি পাই। আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। কেননা চট্টগ্রাম বন্দরের কাজের গতি আমাদের অজানা নয়। নতুন জেটিতে আমাদের পণ্য খালাস শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বরের ২৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ মধ্যরাতে। কিন্তু ২৯ তারিখ সন্ধ্যার আগে আগে ৩০ শতাংশ পণ্য খালাস বাকি থাকতেই আমাদের দ্রুত বন্দর ত্যাগ করতে বলা হয়। আমরা অবাক হইনি। কেননা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ম্যাটেরিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকেও আমাদের ঝড়ের সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছিল। বে অব বেঙ্গলের সমুদ্র কতটা আনপ্রেডিকটেবল, আমাদের ধারণা আছে। কিন্তু এ রকম আকস্মিক ঝড়ের কথা আমি কোনো দিন শুনিনি। আমাদের ক্রুদের অনেকেই চট্টগ্রাম শহরে গিয়েছিল বাজারসদাই করতে। তাদের জরুরি তলব করে দ্রুত নোঙর তুলে আমরা আউটার অ্যাংকরেজ চার্লিতে ফিরে আসি। খোলা সাগরের বুকে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করতে থাকি ঝড়ের। এইটাই নিয়ম। ঝড়ের সময় জাহাজ বন্দরে রাখা হয় না। গভীর সমুদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, যাতে বন্দরের জেটির সঙ্গে ধাক্কা না লাগে।

ভোর চারটার দিকে ঝড় আঘাত হানে বন্দরে। ২২ বছরের নাবিক জীবনে আমি সমুদ্রে বহু ঝড় দেখেছি। কিন্তু এবার যা দেখলাম, আমার পক্ষে বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের জাহাজের ক্যাডেট ইঞ্জিনিয়ার এডওয়ার্ড গ্রিনভিল শিক্ষানবিশ। ল্যাঙ্কাশায়ারে বাড়ি। ব্রিস্টলে কোনো একটা নৌবিদ্যার কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডব দেখে কেবিনে বসে ছেলেটা সারা রাত ধরে কান্নাকাটি করল। যিশুর নাম ধরে ডাকাডাকি।

হার্বার মাস্টার আমিনুল ইসলামের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঝড় কখন আঘাত হেনেছিল?

আমিনুল ভোর চারটার পর। আজানের আগে আগে।

প্রশ্ন আপনারা পোর্ট পুরোপুরি ক্লিয়ার করেছিলেন?

আমিনুল মোটামুটি। সাতটা কনটেইনার জাহাজ ছিল। তাদের সবাইকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে বন্দর ছেড়ে যেতে বলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা। যেসব জাহাজের ড্রাফট বা তলার গভীরতা সাড়ে ৯ মিটারের বেশি, সেগুলো বন্দরে এমনিতেই ঢুকতে পারে না। কার্গো ভেসেলগুলো এর কম ড্রাফটের হয়। বাল্ক কার্গোগুলো বেশি ড্রাফটের। সেগুলো আউটার অ্যাংকরেজে থাকে। মানে বন্দরের নিকটবর্তী খোলা সমুদ্রে। ঝড়ের সময় সবাইকে খোলা সমুদ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : এটুকু আমরা জানি।

আমিনুল : বলে রাখছি, যাতে আমাদের ভুল না বোঝেন।

প্রশ্ন : এই ঝড়ের ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু কি আপনাদের চোখে পড়েছে?

আমিনুল : না তো।

প্রশ্ন আপনারা অ্যালার্ট ওয়ানে না গিয়ে সন্ধ্যায় কেন সরাসরি অ্যালার্ট ফোরে চলে গেলেন?

আমিনুল : কারণ ঝড়টা খুব কাছে চলে এসেছিল।

প্রশ্ন : হঠাৎ?

আমিনুল : হঠাৎ।

প্রশ্ন : কোথায় শুরু হয়েছিল ঝড়টা?

আমিনুল : সেটা আবহাওয়া দপ্তর বলতে পারবে। আমরা কী করে বলব?

প্রশ্ন : ঝড়ের পর কী হয়েছিল?

আমিনুল ঝড়ের পর সব শান্ত। কোনো ডিসট্রেস কল আসেনি। কোনো এসওএস বার্তা নেই। ভোরবেলা বন্দরের একটা টহল দল টাগ বোট নিয়ে আউটার অ্যাংকরেজগুলো ইন্সপেকশন করে এসেছে।

প্রশ্ন : সেখানে তারা অস্বাভাবিক কিছু পায়নি?

আমিনুল : সব জাহাজ অক্ষত ছিল। কোনো জাহাজ বিপাকে পড়েনি।

প্রশ্ন : আমরা আবার প্রশ্ন করছি। টহল দল কি অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনুল : পেয়েছে।

প্রশ্ন : কী সেটা?

আমিনুল তারা ওয়াকিটকিতে যা জানাচ্ছিল, আমরা সেটার কোনো মানে বুঝতে পারছিলাম না।

প্রশ্ন কোথায়?

আমিনুল ব্রাভো আর চার্লির মাঝামাঝি। আউটার অ্যাংকরেজে উন্মুক্ত সমুদ্রের একটা অঞ্চলকে আমরা বলি আলফা, একটাকে বলি ব্রাভো। আরেকটাকে বলা হয় চার্লি।

প্রশ্ন জানি। সেখানে কী দেখতে পেয়েছে তারা?

আমিনুল আপনারা তো সেটা জানেন। আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন?

প্রশ্ন : বটে, বটে। তা, শুনে আপনারা কী করলেন?

আমিনুল আমরা তাদের ফিরে আসতে বলি। দ্বিতীয় আরেকটা দল পাঠাই আমরা সকাল ১০টার দিকে। এটায় ইন্সপেকশন বিভাগের প্রধান রশীদুদ্দীন পাটোয়ারি ছিলেন।

প্রশ্ন তিনি কী দেখলেন?

আমিনুল তিনিও একই জিনিস দেখেছেন।

প্রশ্ন ওটা তখনো ওখানেই ছিল?

আমিনুল ছিল। একই জায়গায়। একইভাবে।

প্রশ্ন এবার শুধু রেকর্ড রাখার খাতিরে আপনি কিছু জিনিস বলুন। আমরা জানি কি জানি না, সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমরা প্রশ্ন করব, আপনি সরাসরি জবাব দেবেন।

আমিনুল ঠিক আছে।

প্রশ্ন : রশীদুদ্দীন পাটোয়ারি কী দেখতে পেয়েছিলেন?

আমিনুল : তিনি সমুদ্রের পানিতে একটা বিশাল জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। বিশাল। আর অচেনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষ্য ৫
রশীদুদ্দীন পাটোয়ারি, সিনিয়র নেভাল ইন্সপেক্টর
চট্টগ্রাম বন্দর

প্রথম অবস্থায় বুঝতে পারছিলাম না, জিনিসটা কী।

ঝড়ের পর সমুদ্র ঝকঝকে পরিষ্কার আর অস্বাভাবিক শান্ত। কিন্তু আলফা আর চার্লির মাঝখানে এই জায়গাটা কেমন ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া। অস্বাভাবিক সেই কুয়াশার ভেতরে আমাদের ছোট্ট টাগ বোটটা যখন ঢুকল, মনে হলো একটা প্রাচীন গুহায় ঢুকছি। হুট করে বাতাসটা ঠান্ডা হয়ে গেল। তাপমাত্রা যেন ধপ করে নেমে গেল কয়েক ডিগ্রি।

আমরা সামনে তাকিয়ে আছি। খুব বেশি দূর দৃষ্টি চলে না : এ কারণে বুঝতেই পারিনি একটা জাহাজের খোলের কয়েক হাতের মধ্যে চলে গিয়েছি। আরেকটু হলে আমাদের টাগ বোট ধাক্কা খেত খোলের গায়ে। জাহাজটা এতো বড়, হঠাৎ মনে হলো, কুয়াশার মধ্যে একটা কালো ছায়া যেন আমাদের গ্রাস করতে আসছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাডার সেকশনের মঈনুদ্দীন মাহমুদ। তিনি আমার জামার আস্তিন খামচে ধরলেন। আর তখন সব কুয়াশা কেটে গিয়ে সামনে ভেসে উঠল পুরো জাহাজটা।

এ রকম জাহাজ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। না, ঠিক বলছি না। দেখেছি। বইপত্রে, সিনেমায়। কাঠের একটা সুবিশাল গ্যালিয়ন বা পাল তোলা জাহাজ। চার কি পাঁচ শ বছর আগে এ রকম জাহাজে চেপে বণিক আর অভিযাত্রীরা বেরিয়ে পড়তেন নতুন মহাদেশ আর সমুদ্রপথ আবিষ্কারে।

এ জাহাজ কবে জাদুঘরে স্থান করে নিয়েছে। এটা এখানে এল কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষ্য ৬
মঈনুদ্দীন মাহমুদ, অপারেটর, রাডার সেকশন

জাহাজটাকে ঘিরে বেশ কয়েকবার চক্কর দিল আমাদের টাগ বোট। আমরা বেশ কিছুক্ষণ উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করলাম : 'কেউ কি আছেন? সাড়া দিন।'

জাহাজের গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল। কোনো সাড়াশব্দ নেই।

মৃদু ঢেউয়ে জাহাজটা ধীর গতিতে দুলছে। আর অদ্ভুত একটা কটকট আওয়াজ উঠছে, গা ছমছম করা।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, জাহাজের ডেকে উঠতে হবে। কিন্তু ডেক এত উঁচুতে, ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না।

অনেক কষ্টে পেছনে দড়ির মই ছুড়ে অবশেষে দুপুরের দিকে ডেকে উঠতে পারলাম আমরা দুজন। আমি আর রশীদুদ্দীন পাটোয়ারি।

পুরো জাহাজে একটা লোকও নেই। পরিত্যক্ত।

ভাষ্য ৭
রশীদুদ্দীন পাটোয়ারি, সিনিয়র নেভাল ইন্সপেক্টর
চট্টগ্রাম বন্দর

আমরা যেন বর্তমান ছেড়ে পুরোনো একটা যুগে প্রবেশ করেছি। চার মাস্তুলবিশিষ্ট বিশাল এক গ্যালিয়ন। এখন পাল গুটিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা গোটানো পাল আর দড়িদড়ার ওপর দিয়ে হাঁটলাম। ডেক, কোয়ার্টার ডেক, ব্রিজ ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে আমাদের মনে হচ্ছিল, জাহাজটাকে কিছুতেই পরিত্যক্ত বলার জো নেই। একটু আগেও যেন এখানে লোকজন ছিল। পুরো জাহাজ ক্রু আর খালাসিতে গিজগিজ করেছে। তাদের সবার কর্মব্যস্ততার ছাপ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কাপ্তানের কক্ষে কাঠের টেবিলে পুরোনো মানচিত্র আর কম্পাস এমনভাবে ছড়িয়ে রাখা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন একটু আগেও কাপ্তান এখানে কাজ করছিলেন। খালাসিদের বিছানাগুলো এখনো উষ্ণ। যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে গেছে। এমনকি কিচেনে ঢুকে দেখি, তরকারি আর মাংস কুটে রাখা হয়েছে। সেলারে ওয়াইনের পিপায় ওয়াইন ভরা। কোনো এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সবাই যেন তড়িঘড়ি জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। অথবা আমাদের ডেকে উঠতে দেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে সবাই। লুকিয়ে আছে জাহাজেরই কোথাও। পুরো ব্যাপারটা এমন বেখাপ্পা, আমরা মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিলাম না। যেন বহুকাল আগে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাওয়া এক জাহাজ ঝড়ের ঘূর্ণিতে পড়ে এত বছর পর উঠে এসেছে। কিন্তু সবকিছু এত পরিপাটি আর উষ্ণ থাকে কী করে?

জাহাজের খোলে কাঠের ওপর খোদাই করা নাম অনেক কষ্টে উদ্ধার করতে পারলাম 'সান্তা কাতারিনা দো মন্তে সিনাই'।

বড় অদ্ভুত নাম। কাপ্তানের কক্ষেও কাগজপত্রে এই নাম পেয়েছি। পরে খোঁজখবর করে জেনেছি, পর্তুগিজ আর্মাদাদের বহরে এ রকম নামধাম একসময় দেখা যেত। বিশেষ করে মসলা আর মসলিনের বাণিজ্যের জন্য এ অঞ্চলে যেসব সওদাগরি জাহাজ আসত, সেগুলোর কোনো কোনোটায় এই তরিকার নামের দেখা মিলত। আমাকে এইসব পরে জানিয়েছেন শৈলেনদা, মানে শৈলেন ব্যানার্জি, আমাদের নেভাল একাডেমির সাবেক অধ্যাপক।

আবহাওয়াবিদ শাকিল আব্বাসের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন আমরা শুধু দুটি প্রশ্ন করব আপনাকে। আপনি ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।

আবহাওয়াবিদ করুন।

প্রশ্ন কোনো লঘুচাপ সৃষ্টি না হয়ে, কোনো রকম মধ্যবর্তী দশা না পেরিয়ে শূন্য থেকে সমুদ্রে একটা পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবহাওয়াবিদ পারে।

প্রশ্ন : কীভাবে?

আবহাওয়াবিদ পৃথিবীর মাথা খারাপ হয়ে গেলে।

প্রশ্ন এই ঘূর্ণিঝড়ের একটা অস্বাভাবিক দিক নিয়ে আপনি এর আগে পত্রপত্রিকায় একটি মন্তব্য করেছেন, আমাদের কানে এসেছে।

আবহাওয়াবিদ কী সেটা?

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, এই ঘূর্ণিঝড়টির বাতাস উল্টো দিকে ঘুরছিল।

আবহাওয়াবিদ : বলেছি।

প্রশ্ন : আপনি কি একটু বুঝিয়ে বলবেন?

আবহাওয়াবিদ : পৃথিবীর আবর্তনের কারণে উত্তর গোলার্ধে যত সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়, সেগুলোর বাতাস ঘোরে ক্লকওয়াইজ, মানে ঘড়ির কাঁটার দিকে। আর দক্ষিণ গোলার্ধের ঘূর্ণিঝড়গুলো ঘোরে অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ, মানে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে। কিন্তু উত্তর গোলার্ধে হওয়া সত্ত্বেও এই ঝড়টির বাতাস ঘুরছিল অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ।

প্রশ্ন : এটা কি সম্ভব?

আবহাওয়াবিদ : সম্ভব।

প্রশ্ন কীভাবে?

আবহাওয়াবিদ পৃথিবীর মাথা খারাপ হয়ে গেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্কাডিয়ান ছন্দ

আজও লোকটাকে দেখলাম। রাস্তার উল্টো দিকে অচেনা ঝাঁকড়া গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। একটানা। পায়ের ভর একবারও বদল করল না। এ থেকে বোঝা যায়, এ লোক কেমন প্রশিক্ষিত।

লোকটার মধ্যে একটা অলস অন্যমনস্ক ভাব। একবারও আমার দোতলার জানালার দিকে তাকাল না। উল্টো দিকে খেলার মাঠে ছেলের দল ক্রিকেট খেলছে। সেদিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল, যেন খেলা দেখছে।

চার ঘণ্টা পর লোকটা চলে গেল।

জানালার পর্দা সামান্য ফাঁক করে দেখি, তার জায়গায় আরেকটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। একই রকম উদাস ভঙ্গি। বুঝলাম, ডিউটি বদল। এরা এখন চব্বিশ ঘণ্টাই নজর রাখছে আমার ওপর। এরা টের পেয়ে গেছে, আমি মরিয়া হয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করছি। কীভাবে টের পেয়েছে, আমি জানি না।

বাইরে বাইরে আমি তো একই রকম নিরীহ ভাব বজায় রাখছি। প্রতিদিনের মতো মোড়ের দোকানটায় পাউরুটি আর মাখন কিনতে যাচ্ছি। পোষা কুকুরটাকে হাঁটিয়ে আনছি বিকেলবেলা। আর পেনশনের টাকা তুলতে মাসে একবার করে যাচ্ছি সদর রাস্তার ব্যাংকটাতে। আর তো কোথাও যাচ্ছি না। কারও সঙ্গে দেখা করছি না। আমার কাছেও কেউ আসছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে টেলিফোন করছি না। করতে চাইলেও লাভ নেই। ফোন তুললেই যেভাবে একটা খট করে আওয়াজ হয়, বুঝতে পারি, আড়ি পাতা হয়েছে।

ওরা অবশ্য আঁচ করতে পারছে, আমি সবকিছু লিখে রাখতে শুরু করেছি। কিন্তু কোথায় লিখে রাখছি, কীভাবে লিখছি, কিছুতেই বুঝতে পারছে না। আমি বাইরে বেরোলে ওরা সারা ঘর আঁতিপাঁতি করে তল্লাশি চালায়, আমার লেখার টেবিল, দেরাজ তছনছ করে, বিছানার তোশক, বালিশের তুলা বের করে ফেলে, কিন্তু কোথাও কিছু খুঁজে পায় না।

ওরা কিছুই খুঁজে পাবে না। কেননা আমি এমন এক অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার করে লিখছি, যা ওদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। সবার চোখের সামনে আমি প্রতিদিন একটু একটু করে লিখে রাখছি আমার প্রতিবেদন। ওরা দেখছে, কিন্তু টের পাচ্ছে না। এই নিশ্ছিদ্র নজরদারির মধ্যেও কীভাবে বোকা বনছে ওরা, ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। নিজেদের যত চালাক ভাবুক, ওরা তো বোকাই। নাহলে আমার ডাইনিং টেবিলে লবণ আর মরিচদানিগুলোর দিকে কেন ওরা একবারও সন্দেহের চোখে তাকাবে না? কেন বুঝতে পারবে না, প্রতিদিন ওগুলোর সজ্জা বদলের মধ্যে প্যাটার্ন লুকিয়ে আছে? টরে টক্কা, টরে টক্কা, টক্কা টরে টরে। মোর্স কোড! গর্দভেরা, এ অতি মামুলি মোর্স কোড। আদি অকৃত্রিম মোর্স কোড।

লবণদানি-মরিচদানি; লবণদানি-লবণদানি, মরিচদানি-লবণদানি, মরিচদানি-মরিচদানি।

হা-হা-হা-হা।

আমার ক্যামেরায় প্রতিদিন একবার করে তুলে রাখছি আমার ডিনার করার ছবি। বিশেষ কায়দা করে সেলফি তুলছি, যাতে লবণদানি-মরিচদানিগুলো দেখা যায়, আবার সেগুলো ছবিতে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ফুটে না ওঠে। ছবিগুলো প্রিন্ট দিয়ে তারিখ লিখে সাজিয়ে রাখছি আমার ব্যক্তিগত অ্যালবামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা সেই অ্যালবামের পাতায় চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকছে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবির সামনে-পেছনে যাচাই করে দেখছে, কোনো জলছাপ আছে কি না। তারপর হতাশ হয়ে রেখে দিচ্ছে।

আমি জানি, আমাকে বেশি দিন সময় দেওয়া হবে না। খুব শিগগিরই সেই বিশেষ দিনটি আসবে, যেদিন বিকেলে আমি আমার কুকুরটাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোলে একটা সাদা মাইক্রোবাস আমাকে অনুসরণ করবে। রাস্তার নির্জন অংশে দুটি ল্যাম্পপোস্টের মাঝখানে ওরা মাইক্রোবাস থামাবে। তারপর দরজা খুলে দুজন লোক এসে আমাকে দুদিক থেকে ধরে ঝট করে টেনে তুলবে মাইক্রোবাসে। আমার কুকুরটা ভীষণ ঘেউঘেউ করতে থাকবে। কিছুক্ষণ ছুটবে সেটা মাইক্রোবাসটার পেছন পেছন। তারপর একসময় দাঁড়িয়ে পড়বে বড় রাস্তার মোড়ে। তাকিয়ে থাকবে অপসৃয়মাণ সাদা মাইক্রোবাসটার দিকে।

সেই বিকেলবেলা আসার আগেই আমি পুরোটা লিখে ফেলতে পারব আশা করছি। আমি জানি, আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আমার অন্তর্ধানের খবর জানাজানি হওয়ার পর যে লোকগুলো এই বাসায় পা রাখবেন, তাঁদের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স ক্লেইমের সেই তরুণ পরিদর্শকও থাকবেন, যাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টির ওপর ভরসা করে আমি এত কিছু সাজিয়েছি। আমি জানি, ওই তরুণ পেশাদার পরিদর্শক আমার ব্যক্তিগত ছবির অ্যালবামটি হাতে তুলে নেবেন এবং সেটার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে তাঁর ভ্রু কুঁচকে যাবে। একই লোকের প্রতিদিনের নৈশাহারের ছবি যত্নে সাজিয়ে রাখার মধ্যে তিনি মানসিক অসুস্থতার বাইরে আরও কিছুর গন্ধ খুঁজে পাবেন এবং এই অ্যালবামটি তিনি তাঁর কাছে রেখে দেওয়ার অনুমতি জোগাড় করে ফেলবেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে। নিজ বাসায় পড়ার টেবিলে রাতের পর রাত তিনি আমার অ্যালবামের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকবেন—এটা আমি একপ্রকার নিশ্চিত। তারপর কোনো এক ভোররাতের দিকে যখন আমার পোষা কুকুরের ডাকাডাকির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি উঠে পড়ার টেবিলে বসে টেবিলবাতি জ্বালিয়ে আরেকবার অ্যালবামটায় চোখ বোলাতে শুরু করবেন, সেই মুহূর্তে ছবির ডাইনিং টেবিলের লবণদানি আর মরিচদানিগুলোর দিকে তাঁর চোখ আটকে যাবে।

এই সামান্য কয়েকটা দৈব ঘটনার শিকল আশা করা কি এতই বাতুলতা?

বাইরে কুকুরটা একটানা ডাকাডাকি করছে। আমি জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলাম। লাইটপোস্টের আলোয় দেখি একটা কুকুর। আমারই জানালার দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়ছে।

অস্বাভাবিক আচরণ। কুকুরেরা সাধারণত এ রকম করে না। এই কুকুরটাকে চেনা চেনা লাগল। কয়েক দিন ধরে এ রকম ডেজা-ভ্যু হচ্ছে। রাস্তাঘাটে এমন কিছু লোক দেখছি, যাদের আগেও দেখেছি বলে আবছা মনে পড়ছে। কিছু লোক যেন ঘুরে ঘুরে আসছে আমার চলার পথে।

আমাকে কি অনুসরণ করা হচ্ছে?

আমার যা পেশা, তাতে এ ধরনের অভিজ্ঞতা নতুন কিছু নয়। বহু লোকের বড় বড় অঙ্কের টাকাপয়সার ভাগ্য ঝুলে থাকে আমার সিদ্ধান্তের ওপর। পেশাটা ঝুঁকিপূর্ণ, এমন বলব না, তবে দুয়েকবার টেলিফোনে হুমকি যে পাইনি, তা তো নয়। কিন্তু এবার পুরো ব্যাপারটায় কী যেন একটা ঝামেলা আছে। চরাচরজুড়ে যেন একটা বিরাট ফিসফাস। কেউ যেন কিছু একটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিছুই স্পষ্ট নয়। সবই ধোঁয়াশা।

এখন আর ঘুম আসবে না। টেবিলে এসে বসলাম। বাতি জ্বাললাম। টেবিলে সেই ক্রোনোবায়োলজিস্টের অ্যালবামটা পড়ে আছে। এটা নিয়ে কয়েক দিন ধরে দারুণ কসরত করছি।

ভদ্রলোক হঠাৎ করে হারিয়ে গেছেন। এ রকম অন্তর্ধান নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে এই সময়। তবে প্রৌঢ় বয়স পেরিয়ে যাওয়া একটা নির্ঝঞ্ঝাট লোকের এই পরিণতি বরণ করার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। শুরু থেকে কোথাও একটা ঘাপলার গন্ধ পাচ্ছি। অ্যালবামটা তো আরও সন্দেহজনক। একই টেবিলের একই অ্যাঙ্গেলের ছবি প্রতিদিন তুলেছেন ভদ্রলোক। এমনকি প্লেটের খাবারটা পর্যন্ত হুবহু এক। পেছনে দেয়ালঘড়িতেও একই সময় দেখা যাচ্ছে। রাত সাড়ে নয়টা। একটা লোক প্রতিদিন রাত সাড়ে নয়টায় হুবহু একই দৃশ্যের ছবি কেন....এক মিনিট! হুবহু একই দৃশ্য তো নয়। সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন আছে।

টেবিলের লবণদানিগুলো প্রতিটি ছবিতে আলাদাভাবে সাজানো। কেন? তা ছাড়া একটা ডাইনিং টেবিলে এত লবণদানি আর মরিচদানি থাকে নাকি? ব্যাপারটা কী?

চার দিনের চেষ্টায় পুরো সংকেতটা পাঠোদ্ধার করা গেল। সেটার জন্য অবশ্য ধন্যবাদ দিতে হবে আমার হ্যাম রেডিও স্টেশনের বন্ধুকে।

হ্যাম রেডিও হচ্ছে একধরনের শৌখিন রেডিও স্টেশন। এগুলো যারা চালায়, মোর্স কোডের ওপর তাদের একটা দখল থাকে। বাতিল হয়ে যাওয়া একটা সংকেতলিপি যে আজও এভাবে টিকে আছে, সেটা জানা ছিল না।

ক্রোনোবায়োলজিস্টের বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। ভদ্রলোক বার্তা পাঠাতে যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, সেটা বড়জোর ঠান্ডাযুদ্ধের যুগের গুপ্তচরদের মাথায় আসতে পারে, কোনো বিজ্ঞানীর মাথায় নয়। এত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়ের কারণ এখন অনুমান করা যাচ্ছে। তাঁর অন্তর্ধান আর আমার চারপাশে রাস্তাঘাটে কয়েকটা আধচেনা লোকের বারবার ফিরে আসা থেকে সেটা পরিষ্কার।

গুপ্তসংকেত ভেঙে যে বার্তা পাওয়া গেল, তা পড়ে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লাম। কী জানতে পেরেছি, সেটাই এবার লিখে রাখছি। এটাও মোর্স কোডে। তবে একই পদ্ধতি নয়। আমাকে আরেকটা অভিনব পদ্ধতি বের করে নিতে হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইব্রেরির সব বই আমি বাঁধাই করে নিয়েছি সাদা আর কালো মলাট দিয়ে। তারপর শেলফে বইগুলো সাজিয়ে রাখছি মোর্স কোড মেনে। আমার এই বার্তা ভবিষ্যতের অজানা কোনো বুদ্ধিমান পাঠকের উদ্দেশে।

ক্রোনোবায়োলজিস্টের বক্তব্যের কেন্দ্রে আছে সার্কাডিয়ান রিদম। এই জিনিসটা কী, শুরুতেই তা তিনি সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সার্কাডিয়ান রিদম হলো এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর, প্রতিটি জীবের দেহে ক্রিয়াশীল এক অদৃশ্য ছন্দ। একটা জীবদৈহিক ঘড়ি যেন সবার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ঘড়ির বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। ২৪ ঘণ্টার একটা অমোঘ পেন্ডুলাম দুলছে সবার ভেতরে। শুধু মানুষ আর স্তন্যপায়ী প্রাণী নয়, একই ছন্দে দুলছে গাছপালা, সমুদ্রের শৈবাল, এমনকি ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত।

এই ছন্দ যে শুধু ঘুম আর জাগরণের চক্র নিয়ন্ত্রণ করছে, তা-ই নয়, এই ছন্দ মেনে বৃক্ষ ডালপালা মেলছে, বহুকোষী জটিল প্রাণীর দেহে হরমোনের সংকেত ছুটছে কোষ থেকে কোষে।

কিন্তু ছন্দটা ঠিক ২৪ ঘণ্টার ঘড়িতেই বাঁধা কেন? কারণ, পৃথিবী নিজের চারপাশে একবার পাক খেতে ২৪ ঘণ্টা সময় নেয়। দিন-রাতের পালাবদলের এই ছন্দই বহু কোটি বছর ধরে একটু একটু করে জীবদেহে ঢুকে পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রথম ভাবতেন, এই ছন্দের পেছনে বোধ হয় দিনের আলো আর রাতের অন্ধকারের কোনো যোগ আছে। কিন্তু নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, ব্যাপারটার সঙ্গে আলোর ওঠানামার সরাসরি যোগ নেই। কিছু প্রাণীকে মাটির কয়েক শ ফুট গভীরে ঘুটঘুটে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনের পর দিন রেখে দেওয়া হয়েছে, যেখানে আলোর সামান্য রেশও প্রবেশ করতে পারে না। তবু তাদের মধ্যে সেই একই সার্কাডিয়ান রিদম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচল পাওয়া গেছে। যাবতীয় কায়দা-কানুন করেও এই ঘড়ি বন্ধ করা যায়নি। এই ছন্দ মুছে ফেলার কোনো উপায় নেই। তার মানে ঘড়িটা জীবনের আরও গভীরে কোথাও প্রোথিত। হয়তো জীবদেহের ডিএনএ কাঠামোর মধ্যে সেটা গেঁথে দেওয়া আছে।

সার্কাডিয়ান রিদমের এই জ্ঞান সবার আগে লুফে নিয়েছে ওষুধ কোম্পানিগুলো। কেননা মানবদেহে ওষুধ সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে, যদি সার্কাডিয়ান রিদমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধ প্রয়োগ করা যায়। এ কারণে সার্কাডিয়ান রিদম নিয়ে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় ওষুধ কোম্পানিগুলোর গবেষণাগারে।

আমাদের এই ক্রোনোবায়োলজিস্টও সে রকমই এক গবেষণাগারে কাজ করতেন। তবে সেটা ছিল সরকারি ওষুধ কোম্পানির গবেষণাগার। আর তিনি যুক্ত ছিলেন এক বিশেষ ধরনের গবেষণায়। তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল সার্কাডিয়ান স্লিপ ডিজর্ডার।

সেটা আবার কী?

কারও কারও দেহে সার্কাডিয়ান রিদমের এই ছন্দ কিছুটা গড়বড় হয়ে যায়। আর সেটা সবার আগে প্রকাশ পায় তাদের ঘুমের চক্রে। এই চক্র এলোমেলো হয়ে যায়। সার্কাডিয়ান স্লিপ ডিজর্ডারের রোগী অসময়ে ঘুমান, আর অসময়ে জেগে থাকেন। ক্রোনোবায়োলজিস্টরা লক্ষ করলেন, যাদের ক্ষেত্রে এ রকম স্লিপ ডিজর্ডার হয়, তাদের জীবনযাত্রার ধরনে কিছু মিল আছে। এদের বেশির ভাগই বিজনেস এক্সিকিউটিভ। এবং প্রায় সবাই ঘন ঘন বিমানযাত্রায় অভ্যস্ত। গবেষণার একপর্যায়ে আমাদের ক্রোনোবায়োলজিস্ট একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন, শুধু ঘন ঘন বিমানযাত্রা করলেই হবে না, বিমানযাত্রার একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করলেই কেবল এই ডিজর্ডার দেখা দেবে। সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ক্রোনোবায়োলজিস্ট নিশ্চিত হলেন, বিমানযাত্রার এ রকম কেবল একটিই প্যাটার্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব। সেই অশুভ প্যাটার্ন বা পথটি অত্যন্ত জটিল আর শর্তযুক্ত। যেমন ২৩ ডিগ্রি অক্ষাংশ ও ১৭০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা থেকে প্রথমে বিমানে চেপে পশ্চিমে ৭৮ ডিগ্রি অক্ষাংশে যেতে হবে। এই যাত্রায় মাত্র ২ ডিগ্রি দ্রাঘিমা বিচ্যুতি থাকা যাবে। তারপর সেখানে দুই দিন অবস্থানের পর (অবস্থানের দৈর্ঘ্য বেশি বা কম হলে চলবে না) বিমানে চেপে পুব দিকে সরে যেতে হবে ৪৪ ডিগ্রি অক্ষাংশ ও ৭৮ ডিগ্রি দ্রাঘিমায়। এভাবে অন্তত ৩৫টি সুনির্দিষ্ট যাত্রাপথ ও গন্তব্য পেরোলে ৭৭ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে সার্কাডিয়ান স্লিপ ডিজর্ডার দেখা দেওয়ার। মানচিত্রে আঁকলে এই যাত্রাপথটি এমন জটিল হিজিবিজি দেখায়, কোনো মাথামুণ্ডু পাওয়া যায় না।

এই গবেষণা চলার সময় আমাদের ক্রোনোবায়োলজিস্ট গোপনে আরেক ধরনের পরীক্ষা চালালেন। তিনি দেখলেন, এই বিশেষ যাত্রাপথ অনুসরণ করার কারণে শুধু যে মানুষের সার্কাডিয়ান রিদমের তাল-লয় কেটে যাচ্ছে, তা নয়, একই প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে মানুষের অন্ত্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃমিকুলে। এমনকি অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসগুলোরও ছন্দে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এভাবে এগোতে গিয়ে ক্রোনোবায়োলজিস্টের মাথায় একটা বিশেষ চিন্তা উঁকি দিতে শুরু করে, সার্কাডিয়ান রিদম তাহলে অমোঘ নয়। এটা ভেঙে ফেলা সম্ভব।

শুরু হয় সার্কাডিয়ান রিদম নিয়ে আরেক ধরনের গবেষণা। আর সেটা গোপনে। আমাদের ক্রোনোবায়োলজিস্ট এই নতুন গবেষণা চালাতে শুরু করেন পুরোনো গবেষণার সমান্তরালে। সার্কাডিয়ান রিদম মুছে ফেলার বিকল্প পদ্ধতি খুঁজতে থাকেন তিনি। বিমানযাত্রার মতো অত জটিল পথ অনুসরণ নয়। আরও সরল কোনো উপায়। সেটা তিনি পেয়েও যান একসময়। তারপর মানুষ থেকে শুরু করে নানা পশুপাখির সার্কাডিয়ান রিদম মুছে দিতে থাকেন তিনি। আর সেটা করতে গিয়ে নতুন আরেকটা ব্যাপার তাঁর চোখে পড়ে। তিনি লক্ষ করেন, সার্কাডিয়ান ছন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুছে ফেলা মানেই এক ছন্দহীন বিশৃঙ্খলা নয়। বরং প্রাণিদেহে তখন ধীরে ধীরে আরেক ধরনের ছন্দ উঁকি দেয়। সেটা আরেকটু বৃহৎ পরিসরের সার্কাডিয়ান ছন্দ। কিন্তু সেটার চলন-বলন ভিন্ন। আর সেটার ফ্রিকোয়েন্সি বা ছন্দের বিস্তারকাল ২৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট। সবার ক্ষেত্রে। এ যেন সব জীবের মধ্যে লুকিয়ে রাখা আদি ছন্দ। কেন? ঠিক ২৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটই কেন? এর চেয়ে বেশি বা কম কেন নয়?

ক্রোনোবায়োলজিস্টের মনে হলো, তিনি যেন রক অ্যান্ড রোলের আড়ালে লুকানো কোনো জ্যাজসংগীত খুঁজে পেয়েছেন।

এই নতুন সার্কাডিয়ান ছন্দের উৎস নিয়ে গবেষণায় আমাদের ক্রোনোবায়োলজিস্ট এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে তাঁর চারপাশে অপরিচিত কিছু লোকের আনাগোনা তিনি লক্ষই করলেন না। নিজের গবেষণা নিয়ে তিনি যদি অত বেশি মত্ত না থাকতেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর চোখে পড়ত, মধ্যরাতে গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে হেঁটে মেট্রো স্টেশনে যাওয়ার পথে কয়েকজন লোক নিয়মিত তাঁর পিছু নিচ্ছে। এমনকি মেট্রোর কামরা ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও তারা ঠিক তার চারপাশ ঘেঁষে বসছে।

নতুন গবেষণা শুরুর দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্রোনোবায়োলজিস্টের চাকরি চলে গেল। গবেষণাগারের পরিচালক তাঁর হাতে সাদা খাম ধরিয়ে দিলেন। তাঁর অপরাধ কী, সেটার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হলো না। চিঠি হাতে তিনি বেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে শহরের কেন্দ্রীয় পার্কে একটা চেরিগাছের নিচে বেঞ্চে বসে থাকলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। স্ট্রিটলাইটগুলো জ্বলে উঠলে তিনি হেঁটে বাসায় ফিরলেন। সদর দরজায় চাবি ঘোরানোর সময় প্রথমবারের মতো তাঁর খটকা লাগল। তিনি ফিরে তাকালেন এবং রাস্তার উল্টো দিকে ফুটপাতে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। পরের কয়েকটা দিন আরও কিছু খোঁজখবরের পর তিনি নিশ্চিত হলেন, তাঁর জীবনের এই আকস্মিক ট্র্যাজেডির পেছনে সার্কাডিয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিদমসংক্রান্ত গবেষণার যোগ আছে। এই গবেষণা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই যে তাঁর চাকরি খেয়ে ফেলা হয়েছে, এটা বুঝে যাওয়ার পর তিনি আঁচ করতে শুরু করলেন, তাঁর চারপাশে কোথাও গভীর একটা ষড়যন্ত্র পাক খেয়ে উঠছে।

কেন? কেন? কেন?

একই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকল তাঁর মাথায়।

প্রাণিদেহে ২৪ ঘণ্টার সার্কাডিয়ান ছন্দের তলায় ২৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের আরেকটি ছন্দ লুকানো আছে, এই নিরীহ সত্য ধামাচাপা দেওয়ার পেছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কেন এই তথ্য বিপজ্জনক?

চাকরি যাওয়ার ১৭ বছর পর একদিন দুপুরবেলা ক্রোনোবায়োলজিস্ট তাঁর ইউরেকা মুহূর্তটি পেয়ে গেলেন। তিনি তখন পোষা কুকুরকে শ্যাম্পু দিয়ে গোসল করিয়ে রোদে বসিয়ে রেখে পাশে মোড়ায় বসে তাঁর কাছে আসা বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিনগুলোর পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিলেন। একটি ম্যাগাজিনের ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় একটা ছোট্ট আবিষ্কারের খবরের ওপর তাঁর চোখ আটকে গেল। আমাদের গ্যালাক্সির উল্টো প্রান্তে প্রায় সাত হাজার আলোকবর্ষ দূরে এমন একটি গ্রহ পাওয়া গেছে, যে গ্রহের আহ্নিক গতি ২৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট। মানে গ্রহটা ঠিক ২৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটে নিজের চারপাশে একবার পাক খায়।

এ দিয়ে হয়তো বিশেষ কিছুই বোঝায় না। একটা বিদঘুটে অনুমান আর সামান্য কিছু দৈব মিলের ওপর ভর করে কিছুই দাঁড় করানো সম্ভব নয়। কিন্তু পত্রিকার পাতায় শিল্পীর তুলিতে আঁকা ওই গ্রহটির কাল্পনিক ল্যান্ডস্কেপের দিকে মায়াময় চোখে তাকিয়ে থাকলেন আমাদের ক্রোনোবায়োলজিস্ট।

জীবনসায়াহ্নে নিজেদের ফেলে আসা ভূমির ছবির দিকে এভাবেই তাকিয়ে থাকেন শরণার্থীরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলগাশেম প্যারাডক্স

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, কেউ একজন আমার দিকে একটা পিস্তল তাক করে আছে। লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যায়, সে আততায়ী নয়। এক ধরনের অথোরিটি আছে তাঁর মধ্যে। মানে ব্যাপারটা খুন নয়। এক্সিকিউশন।

বিছানা ছেড়ে দেখি ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। কফি বানিয়ে জানালার ধারে বসলাম। বাইরে ঘন কুয়াশায় বেশি দূর দেখা যায় না। একটা গাড়ির হেডলাইট কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে আসছে। আমারটা এ রাস্তার একমাত্র বাড়ি। তার মানে গাড়িটা আমার কাছেই আসছে। আরেকটু কাছে এলে দেখি সেনাবাহিনীর জিপ।

একটা অস্বস্তি ভর করল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলাম।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে উর্দি পরা এক সেনা কর্মকর্তা।

ড. বুলগাশেম?

বলছি।

আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

এক্ষুনি?

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে জিপটা যেদিকে ছুটল, সেটা সেনানিবাস এলাকার উল্টো দিক। আমি চিন্তিত বোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

করলাম। জিপের সহযাত্রীদের কাছ থেকে কিছু জানার উপায় নেই। শহর পেরিয়ে পার্বত্য এলাকার পথ ধরলাম আমরা।

গাড়ি ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা নির্জন পাহাড়ে উঠছি। গাছপালা একটু কমে এলে আকাশে ভেসে উঠল মানমন্দিরের চূড়া।

তখন মনে পড়ল, প্রায় পরিত্যক্ত এই মানমন্দিরে সামরিক লোকজনের আনাগোনার খবর দেখেছি পেপারে। কী ঘটছে, কৌতূহল অনেকের।

মানমন্দিরের পোর্টিকোয় পাহারা দেখে বুঝলাম, ভবনটা আসলে এরই মধ্যে সামরিক স্থাপনায় পরিণত হয়েছে।

অবজারভেশন কক্ষে যে লোকটা আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন, তিনি মানমন্দিরের বেসামরিক কিউরেটর পি রাঘবন। পরিচয় না থাকলেও একাধিক একাডেমিক সেমিনারে আমি তাঁকে দেখেছি।

রাঘবন ও আমার মধ্যে যে কথোপকথন হলো, তার নিরস প্রাতিষ্ঠানিক টোন আমার দৃষ্টি এড়াল না। রাঘবন গবেষক থেকে প্রশাসক হয়ে উঠছেন।

আপনি অবাক হচ্ছেন ড. বুলগাশেম, সন্দেহ নেই।

অবশ্যই। প্রথমত অবাক হচ্ছি, একটা জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দিরে সামরিক উর্দির লোকজন দেখে।

ভুলে যাচ্ছেন কেন, মহাকাশ সংস্থা আসলে প্রতিরক্ষা দপ্তরের অংশ। মহাকাশ গবেষণা তো দিনশেষে সামরিক গবেষণাই।

কিন্তু এভাবে টেকওভারের মানে কী?

আমরা একটা নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে আছি।

কত বড়?

অনেক। আপনি যতটা কল্পনা করতে পারেন, তার চেয়েও বড়।

হুমকির ধরন?

এখনো আমরা পুরোপুরি ঠাহর করতে পারিনি।

উৎস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবটা বলা যাবে না। শুধু বলব, হুমকিটা আসছে বাইরের দিক থেকে।

বাইরের দিক মানে?

বাইরের দিক মানে বাইরের দিক।

রাঘবনের কথার মধ্যে এমন একটা ইশারা ছিল, আমরা দুজনেই মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। দুপুর হয় হয়। কুয়াশা কেটে ঝকঝকে রোদে চোখ ঝলসে যাচ্ছে।

আমি অবিশ্বাস ভরা চোখে রাঘবনের দিকে তাকালাম। প্রতিবাদ করে উঠলাম, দয়া করে এ কথা বলবেন না যে আমরা সংকেত পাচ্ছি।

বলব।

মানে?

মানে আমরা সংকেত পাচ্ছি। অবশেষে। দু শ বছরের টানা চেষ্টার পর।

মানে কেউ সংকেত দিচ্ছে?

দিচ্ছে।

মানে বাইরে সত্যি কেউ আছে!

আছে। এখন আমরা মোটামুটি নিশ্চিত।

তাহলে ঘোষণা করছেন না কেন? এত বড় বৈপ্লবিক, বিস্ফোরক তথ্য কেন চেপে রাখছেন?

কারণ আমরা কনফিউজড।

এই না বললেন, আপনারা নিশ্চিত?

নিশ্চিত, আবার কনফিউজড।

মানে?

আমরা আমাদের রিসেপ্টরে যেসব ডেটা পাচ্ছি, সেগুলো যে সজ্জাতেই সাজানো যাক না কেন, কতগুলো মৌলিক অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে, সেগুলো এত মৌলিক যে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। নানা রকম গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে সেগুলো ফিল্টার করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজ হয়নি। এগুলোর ব্যাখ্যার পঞ্চাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম হাইপোথিসিস দাঁড়িয়ে গেছে। সেগুলো ঝাড়াই-বাছাই করে শেষ পর্যন্ত যেটা টিকেছে, যেটা জিগস'-পাজলের টুকরোগুলোকে খাপে খাপে বসিয়ে দিতে পেরেছে, সেই হাইপোথিসিস মেনে নেওয়ার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত নই।

কী সেটা?

আমরা এর নাম দিয়েছি হিট্টি প্রোপোজিশন। গণিতবিদ প্রফেসর হিট্টির নাম শুনেছেন তো?

আমি গণিতের লোক নই।

আমি খুব সরল করে শুধু সিদ্ধান্তটা বলি। প্রফেসর হিট্টি বলছেন, আমরা যেসব ডেটা পাচ্ছি, সেগুলো কোনো করপোরাল উৎস থেকে আসছে না।

মানে?

এগুলোর কোনো জাগতিক প্রতিরূপ নেই। মানে এর কোনো বস্তুগত উৎস সরাসরি মিলবে না।

আধ্যাত্মিক ব্যাপার নাকি? সুফিবাদ?

না। সুফিবাদ নয়। প্রফেসর হিট্টি বলছেন, আমরা যেসব ডেটা পাচ্ছি, সেগুলো আসলে স্বপ্নের উপকরণ মাত্র।

স্বপ্ন মানে?

স্বপ্ন মানে স্বপ্ন, আমাদের ঘুমের মধ্যে যেগুলো মস্তিষ্কের মধ্যে তৈরি হয়, বিজ্ঞানের এই তুরীয় অগ্রগতির কালেও যেগুলোর কারণ বা প্রকৃতি আমরা খুব একটা উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি।

আমি থ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। দেখি, কথাটা বলে রাঘবন অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। বিব্রত ভাব লুকানোর চেষ্টা।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ ওভাবেই বসে থাকলাম। শেষে আমি বললাম, এটা কোনো প্র্যাকটিকাল জোক নয় তো?

জোক নয়। আমাদের হাতে আর কোনো বিকল্প হাইপোথিসিস নেই। আমরা একপ্রকার নিরুপায়।

তাহলে একটা দুশ বছরের উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের এই পরিণতি? মহাবিশ্বে আমরা আমাদের দোসর পেলাম বটে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোটা পেলাম না, পেলাম শুধু তাদের স্বপ্ন?

এক দিক থেকে দেখলে তা-ই। হুম, খুব ক্রুড অর্থে তা-ই বটে। কোনো এক অদ্ভুত কারণে ওদের স্বপ্নগুলো ট্রান্সমিটেড হচ্ছে। আর সেটা ট্রান্সমিটেড হচ্ছে একটা রেগুলার লুপবিশিষ্ট রেডিও-থারমাল তরঙ্গের আকারে, আমাদের রিসেপ্টরগুলো যেটা ডিকোড করতে সক্ষম।

আমি একটু অধৈর্য হয়ে পড়লাম। বললাম, তা এখানে আমার ভূমিকাটা কী? আমাকে তলব কেন?

আপনি কিছু অনুমান করতে পারছেন না?

না। পারছি না।

দেখুন, নিউরোলজিস্ট প্রফেসর সাইলো দোলুশ আপনার নাম প্রস্তাব করেছেন। আমরাও আপনার রেকর্ডস ঘেঁটেছি। অবসরে যাওয়ার আগে আপনি কমপ্যারেটিভ ফিলোলজি পড়াতেন। তার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটা ডিপার্টমেন্ট খোলার চেষ্টা করেন আপনি, যার বিষয়বস্তু বিভিন্ন পুরোনো বিলুপ্ত বিদ্যা।

যেটা চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয় রাজি হয়নি।

হয়নি। ফান্ড-সংকটে আটকে গেছে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়েছিল কথাবার্তা। আপনি কিছু কোর্স আউটলাইন জমা দিয়েছিলেন। সেখানে একটা জায়গায় সাইকো-অ্যানালাইসিস নামে একটা বিষয়ের উল্লেখ আছে।

ও আচ্ছা, এখন কিছুটা আঁচ পাচ্ছি বটে। হ্যাঁ, সাইকো-অ্যানালাইসিসের উল্লেখ ছিল।

এ বিষয়ে আমার তেমন জানাশোনা নেই। তবে প্রফেসর দোলুশ বলেছেন, সেকেলে হয়ে যাওয়া এই বিদ্যা চর্চা করেন, এমন কেউ আর অবশিষ্ট নেই। একজন ছাড়া। আপনিই পৃথিবীর শেষ জীবিত সাইকো-অ্যানালিস্ট।

অতিরঞ্জন।

আপনি বিনয়ী।

আপনারা কী চান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইকো-অ্যানালাইসিসের সঙ্গে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের কোনো যোগ কি আছে?

পরোক্ষভাবে আছে। দেখুন, প্রথমত এটা একটা অকেজো বিদ্যা। উনিশ শতকের শেষ দিক আর বিশ শতকের শুরুর দিকে এটার চর্চা গড়ে উঠেছিল। বেশিদিন টেকেনি। কারণ, মনের রোগ সারাইয়ের জন্যে এই বিদ্যা এমন কিছু হাইপোথিসিসের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, যেগুলো পরবর্তীকালে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।

বুঝলাম। কিন্তু স্বপ্ন নিয়ে এই বিদ্যা কিছু দাবি করেছিল কী?

করেছিল। এটা ওই বিদ্যার একটা অফশ্যুট বলতে পারেন। দাবি করা হয়েছিল, মানুষের স্বপ্নের উপকরণগুলোকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, যা থেকে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের অবস্থার একটা অনুমান পাওয়া যাবে।

তাই নাকি?

এই বিদ্যার যিনি ফাউন্ডার...

সিগমুন্ড ফ্রয়েড।

হ্যাঁ, তিনি এই চর্চাটাকে কিছুদূর এগিয়েও নিয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন বা ড্রিম ইন্টারপ্রিট করতে পারতেন বলে দাবি করতেন। স্বপ্নের উপকরণগুলোকে তিনি সেইভাবে ব্যবহার করতেন, মাইক্রোস্কোপের নিচের বায়োলজিক্যাল নমুনাকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এ বিদ্যার মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়। এই শাখার অপমৃত্যু ঘটে।

আমরা যা চাই, তা খুবই পরিষ্কার। আপনি ওই বিদ্যার কলাকৌশল প্রয়োগ করে আমাদের দেওয়া ডেটা বিশ্লেষণ করবেন। স্বপ্নের উপকরণ আপনাকে দেওয়া হবে। তা থেকে আপনি স্বপ্নদ্রষ্টাদের মন পড়ার চেষ্টা করবেন। আপনি তাদের সভ্যতা, তাদের সমাজ, তাদের আইন-কানুন পুনর্নির্মাণ করবেন। আর বোঝার চেষ্টা করবেন তাদের অভিপ্রায়।

প্রায় অসম্ভব কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন?

দুটি খুবই নড়বড়ে হাইপোথিসিসের ওপর ভর করতে বলা হচ্ছে আমাকে। প্রথমত, অনুমান করে নিতে হচ্ছে, আমাদের দোসরদের...

আমরা তাদের একটা কাজচলতি নাম দিয়েছি—সেকেন্ড কমিউনিটি।

বেশ, ভালো নাম। আচ্ছা, প্রথমত অনুমান করে নিতে হচ্ছে, এই সেকেন্ড কমিউনিটির লোকজনের বায়োলজিক্যাল চাহিদা আমাদেরই মতো, অর্থাৎ খাদ্য, ঘুম এবং যৌনতা ইত্যাকার ব্যাপারগুলোর প্যাটার্ন অভিন্ন। আর দ্বিতীয়ত, সাইকো-অ্যানালাইসিসের মৌলিক স্বীকার্যগুলো পৃথিবীতে মানুষের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য, সবখানে সেটা সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এগুলো সর্বজনীন। এত বড় দাবি স্বয়ং ফ্রয়েডও করতেন না।

আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে ব্ল্যাংক চেক দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ব্যর্থ হলে আমাদের হারাবার কিছু নেই। জুয়ার বোর্ডে অন্ধ দান মারতে সমস্যা কী!

কিন্তু আমাকে এ কাজের যোগ্য মনে করার কোনো কারণ আছে কি?

আছে। অধ্যাপনার শেষ দিকে আপনি কিছু পেপার উপস্থাপন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, সেগুলো আপনার উন্মাদনা রোগের বহিঃপ্রকাশ। অনেকে বলেন, আপনাকে বাধ্যতামূলক রিটায়ারমেন্টে পাঠানোর পেছনে কাজ করেছে দলীয় রাজনীতি। আবার অনেকের সন্দেহ, এ ক্ষেত্রে ওই পেপারগুলোর ভূমিকাও কম নয়। পেপারগুলোর বিষয়বস্তু ড্রিম-অ্যানালাইসিস। আপনি একটা মহাজাগতিক স্বপ্নের হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলেন। কী সেটা, আমাদের ধারণা নেই। তবে আপনার ব্যাপারে প্রফেসর দোলুশের শক্ত সুপারিশ আছে।

আপনি শুরুতে কী একটা নিরাপত্তা হুমকির কথা বলছিলেন।

হুমকি আছে। অতি সম্প্রতি আমাদের একের পর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট বিকল হয়ে যাচ্ছে। সবগুলোই মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট। প্রথমে অ্যাক্সিডেন্টাল মনে করা হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা প্যাটার্ন পাওয়া যাচ্ছে। আরও বেশ কিছু অঘটন ঘটেছে, সবটা খুলে বলা যাচ্ছে না। এগুলো যোগ করলে একটা ইনভেশনের আলামত পাওয়া যায়। আর হুমকিটা যেদিক থেকে আসছে, এই স্বপ্নের উপকরণগুলোও সেদিক থেকে আসা। দুটোর মধ্যে আদৌ কোনো যোগসূত্র আছে কি না, আমরা জানি না। আমরা আপনার অ্যানালাইসিসের দিকে তাকিয়ে আছি।

তার মানে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা রাষ্ট্রীয় আর্জেন্সি আছে।

আছে বললে কম বলা হবে।

তার মানে আমার কোনো চয়েস নেই?

নেই। আগামী কয়েক দিন আপনি এখানেই থাকছেন। সব বন্দোবস্ত করা আছে। আর আপনার জন্যে এখানে একটি বিশেষ কক্ষ বানানো হয়েছে। একটা সিমুলেশন রুম। আমরা নাম দিয়েছি ড্রিম রুম।

সেটা কী?

এই সব টু ডাইমেনশনাল ডেটাগুলোর আমরা থ্রি-ডাইমেনশনাল প্রতিরূপ নির্মাণ করছি। কিছুটা হলোগ্রাফিক ইমেজের মতো। আপনার বুঝতে সুবিধা যাতে হয়।

আজ সন্ধ্যায় আমি ড্রিম রুমে ঢুকছি।

একটা গোলাকার সিলড অন্ধকার কক্ষে আমাকে প্রবেশ করতে হবে। তার ভেতরে ভেসে বেড়াবে সৃষ্টির ওপার থেকে আসা অচেনা স্বপ্নের উপকরণ। তাদের ত্রিমাত্রিক চেহারা কেমন হবে, আমার কোনো অনুমান নেই।

আমি রাজি হয়েছি, রাজি না হয়ে উপায় ছিল না বলে নয়। রাজি হয়েছি, কেননা আমার নিজের স্বার্থ আছে। আমার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাইপোথিসিসের সত্যাসত্য অনুসন্ধানে এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে? এই হাইপোথিসিসকে পাগলামি মনে করা হয়েছে, ঠাট্টা করা হয়েছে, এর জন্যে আমাকে একাডেমিক নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে।

আমি ড্রিম রুমে ঢুকছি। সকলের চোখে একটা বস্তুগত জগৎ থেকে আমি ঢুকছি বস্তুহীন, অস্থির, কাঁপাকাঁপা এক চৈতন্যলোকে। কিন্তু আমার হাইপোথিসিস, যার আনুষ্ঠানিক নাম বুলগাশেম প্যারাডক্স, তাতে পুরো ব্যাপারটা উল্টানো।

সেকেন্ড কমিউনিটি বলে আসলে কিছু নেই।

আমি কোনো স্বপ্নের ভেতরে ঢুকছি না।

আমি আসলে সাড়ে ১২ শ কোটি বছরের এক অতিকায় মহাজাগতিক স্বপ্নের ভেতর থেকে বেরোচ্ছি।

আমি ড্রিম রুমের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। পেছন ফিরে দেখলাম, একটু দূরে রাঘবন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

আমি তাঁর দিকে এমনভাবে হাত নাড়লাম, যেন বিদায় নিচ্ছি, যেন একটা বোর্ডিং ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

আমার আচরণে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন রাঘবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মইদুল ইসলামের শেষ তিন উপন্যাস

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র *নান্দনিক*-এর বর্ষা সংখ্যায় 'শুয়োপোকার খোলসত্যাগ' শিরোনামে সমালোচক সালাউদ্দীন তাবরেজির একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। দীর্ঘ, তথ্যবহুল এ নিবন্ধে সমালোচক আমাদের সময়কার রহস্যময় লেখক মইদুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। সালাউদ্দীন তাবরেজির পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত। তাঁর গদ্য সুখপাঠ্য, যুক্তি ধারালো এবং অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাঁর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একমত না হওয়ার অবকাশ কম। তবে নিবন্ধের শেষ দিককার কয়েকটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাকে দ্বিমত পোষণ করতে হচ্ছে। আমি সেই জায়গাগুলো তুলে ধরে আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

মইদুল ইসলামের সাহিত্যকীর্তিকে তিনটি ধাপে ভাগ করেছেন সমালোচক—প্রারম্ভিক পর্ব, মধ্য পর্ব (যেটিকে অনেকে তাঁর নিরীক্ষাকাল হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন) এবং চূড়ান্ত পর্ব। মইদুল ইসলামের শেষ তিনটি উপন্যাসকে চূড়ান্ত পর্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সমালোচক এবং এগুলোকে তাঁর সামগ্রিক লেখক জীবনের কালমিনেশন বা চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

এটা অস্বীকার করার জো নেই যে এক দশক ধরে এ রকম বিশ্লেষণ একপ্রকার সাহিত্যিক রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। যেকোনো মনোযোগী পাঠক এটা লক্ষ না করে পারবেন না, এসব সমালোচনা আসলে একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তব্যের চর্বিত চর্বন। একটি লেখা থেকে আরেকটি লেখা আলাদা করা যায় না এবং এগুলো লেখক মইদুল ইসলাম বা তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমাদের নতুন কোনো তথ্য দেয় না।

শেষ তিনটি উপন্যাস সম্পর্কে আমি কেবল যে সমালোচক সালাউদ্দীন তাবরেজি এবং সেই সূত্রে অপরাপর সমালোচক ও বোদ্ধা পাঠকের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি, তা-ই নয়, আমি খুব দৃঢ়ভাবে মনে করি, তারা বিভ্রান্ত। আর এই বিভ্রান্তির উৎস লেখক মইদুল ইসলামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা। এটা অবশ্য পুরোদস্তুর সমালোচকদের দোষ নয়। কেননা জীবদ্দশায় লেখক মইদুল ইসলাম একপ্রকার নির্জন, নিভৃতচারী এবং সর্বোপরি 'তথ্যপ্রতিবন্ধক' জীবন যাপন করে গেছেন। নিভৃতচারী বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ হবে। তিনি অসামাজিক ছিলেন, এ কথা বলার অবকাশ নেই। তিনি আসলে শুধু সাহিত্যিক-সুধীজন-পরিমণ্ডল সযত্নে পরিহার করে চলতেন। সমসাময়িক লেখক-কবিদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ছিল। তিনি কোনো সাহিত্যবোদ্ধা বা কনোইসারদের আড্ডায় যোগ দিতেন না। বাংলা উপন্যাসে ফার্সি শব্দের প্রয়োগ নিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে একদা মৃদু বচসা এবং পত্রিকার পাতায় কয়েকটি চিঠি চালাচালি ছাড়া আমরা সাময়িকপত্রে তাঁর আর কোনো উপস্থিতি দেখতে পাই না। তাঁর বাসাতেও কাউকে তিনি নিমন্ত্রণ জানাতেন না। মইদুল ইসলামের সংসারজীবন সম্পর্কে আমরা অল্পবিস্তর যা জানি, তা তাঁর স্কুলের সহপাঠী এবং মায়ের দিককার আত্মীয় (সম্ভবত মায়ের ফুপাতো ভাইয়ের ছেলে) মির্জা একরামুল বাশারের *দিনশেষের রাঙা মুকুল* নামে ৬৪ পৃষ্ঠার এক অপরিসর গ্রন্থের কল্যাণে। বৈঠকি ঢঙে লেখা এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকাটিকে কোনোভাবেই মইদুল ইসলামের অফিশিয়াল বায়োগ্রাফি বলার অবকাশ নেই, তবে এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না, অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে লেখা, দুর্বলভাবে সম্পাদিত, মুদ্রণপ্রমাদে ঠাসা, 'পুষ্টিহীন' (যেমনটা হুমায়ূন আজাদ এক ঘরোয়া আড্ডায় বলেছিলেন বলে শুনেছি) এই গ্রন্থটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মইদুল ইসলামের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকের ক্ষুণ্নিবৃত্তি। আর এটি মইদুল ইসলামের ব্যক্তিজীবনের অনেক অপ্রয়োজনীয় ডিটেইলের ওপর আলোকপাত করে বটে, তবে তাঁর সৃজনকৌশল, পাঠরুচি, লেখার অভ্যাস বা তাঁর অন্তর্জগৎ সম্পর্কে আমাদের প্রায় কিছুই জানায় না। অনুমান করতে দ্বিধা করছি না, লেখকের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সমালোচক তাবরেজি মহাশয়ের জ্ঞানের দৌড় মির্জা একরামুল বাশারের চটি গ্রন্থটির বাইরে বিস্তৃত হওয়ার অবকাশ পায়নি।

লেখক মইদুল ইসলামের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে ডিটেইল তথ্য অবগত হওয়ার বিষয়টিতে আমি অশেষ গুরুত্ব দিতে চাই। তার কারণ এই নয় যে, নিও রিয়ালিস্টদের মতো আমিও বিশ্বাস করি, লেখকের সাহিত্যকর্ম তাঁর ব্যক্তিজীবনেরই একটি এক্সটেনশন। সে রকম নয়। আমার বিশ্বাস বরং এর বিপরীত কিছুই হবে। আমি যেটা জোর দিয়ে বলতে চাই, সেটা হলো, কেবল লেখক মইদুল ইসলামের ক্ষেত্রে তাঁর শেষ দিককার সাহিত্যকর্মগুলোর যথাযথ মূল্য বিচার করতে হলে তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই কিছু তথ্য জানা থাকতে হবে। আমার সৌভাগ্য যে সেই তথ্যগুলো জানার সুযোগ আমার হয়েছে। কীভাবে হয়েছে, সেটা আমি যথাস্থানে বলব। এক্ষনে শুধু এটা বলে রাখি যে, এসব ব্যক্তিগত তথ্যই মইদুল ইসলামের শেষ তিনটি উপন্যাস প্রশ্নে সমালোচক সালাউদ্দীন তাবরেজির মতামতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণে আমাকে বাধ্য করছে।

আমি খুব সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব তাবরেজির সঙ্গে কেন আমি দ্বিমত পোষণ করি এবং আমার বক্তব্যের ভিত্তি কী।

সালাউদ্দীন তাবরেজি তাঁর ১৫ পৃষ্ঠার নিবন্ধে এটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে মইদুল ইসলামের পূর্বেকার সকল সাহিত্যকর্মের পাশে তাঁর শেষ তিনটি উপন্যাসকে (*গিরগিটি*, *বেহুলার বাসর* এবং *তারাশঙ্করের ডায়েরি*) যতই সাজুয্যহীন বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিসদৃশ দেখাক না কেন, বা তাঁর কট্টর ভক্তদের মধ্যে এগুলো যত হতাশা আর নেতিবাচক আলোড়নই তুলুকু না কেন, এ তিন উপন্যাস তাঁর সাহিত্যিক বাঁক পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে এবং এই বাঁক পরিবর্তনের ধারা আসলে আরও আগে থেকে শুরু হয়েছিল, বিশেষ করে তাঁর অষ্টম উপন্যাস *লুব্ধকের ছায়া* থেকে আমরা এর ইঙ্গিত পেতে শুরু করি। আর এই 'সিন্দাবাদীয় অভিযান' পরিণতি পেয়েছে শেষ তিন উপন্যাসে এসে।

আমি বলব, এটি তাবরেজি মহাশয়ের কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। সাহিত্য আলোচনার একটি সুবিধাজনক দিক হলো, যেকোনো পূর্বানুমানের পক্ষে ভূরি ভূরি তথ্যপ্রমাণ সর্বদা হাতের কাছে হাজির পাওয়া যায়।

এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মইদুল ইসলামের শেষ তিনটি উপন্যাস নিয়ে এত আলোচনার অবকাশ তৈরি হয়েছে মূলত দুটি কারণে : প্রথমত, ওই তিন উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কট্টর (আমি বলব 'জেহাদি') ভক্তরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, একটি অংশ খুব আহত বোধ করেছে এবং তারা এটিকে তাদের প্রিয় লেখকের এত দিনকার র‍্যাডিক্যাল অবস্থানের প্রস্থানবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করেছে. দ্বিতীয় শ্রেণির ভক্তরা তাঁর লেখার এ আকস্মিক ও প্রবল বাঁক পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছে হেনরি জেমস কথিত 'লিটারারি ইনএভিটাবিলিটি' হিসেবে। দ্বিতীয় কারণটি হলো, ওই তিন উপন্যাস বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যা মইদুল ইসলামের মতো একজন কাল্ট লেখকের ক্ষেত্রে কেবল বিস্ময়করই নয়, অস্বাভাবিকও বটে। আমি শুনেছি, তাঁর *গিরগিটি* উপন্যাসটি প্রথম বছরেই সাতটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছিল।

মইদুল ইসলামের লেখনশৈলীর এই 'জন আপডাইকিয়ান উল্লম্ফন' এবং তাঁর পাঠকপ্রিয়তা অর্জনের ঘটনাটি একই সঙ্গে ঘটেছিল। কাজেই এটা সহজে অনুমেয় যে লেখার ভঙ্গিমা বদলানোর কারণেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিবার্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু এটাও ভুললে চলবে না যে এই জনপ্রিয়তা অর্জনের বিষয়টি তাঁর পুরোনো কট্টর ভক্তদের কারও কারও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁরা তখন থেকেই ঘটনাটির নানা রকম ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। বলা বাহুল্য নয়, সালাউদ্দীন তাবরেজির সমালোচনা সেই প্রয়াসের একটি দৃষ্টান্তমাত্র। মইদুল ইসলামের জীবনের শেষ তিনটি উপন্যাসকে "হংস মাঝে বক" হিসেবে না দেখে লেখকের সুচিন্তিত এবং দীর্ঘমেয়াদী খোলস পরিবর্তন হিসেবে দেখা (যে কারণে নিবন্ধের শিরোনাম 'শুয়োপোকার খোলসত্যাগ') এবং এই তিন উপন্যাসকে তাঁর সাহিত্যিক পথপরিক্রমণের চূড়ান্ত পরিণতি প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বস্তিলাভ ঘটে।

আমি এই অবস্থান মেনে নিতে রাজি নই। ওই তিন উপন্যাস যত অস্বস্তিই তৈরি করুক না কেন, আমাদের এটা মানতে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, মইদুল ইসলামের তাবৎ সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে এগুলো সাযুজ্যহীন। এগুলো গ্রহণ করার জন্য তিনি তাঁর পাঠককুলকে মোটেও প্রস্তুত করেননি, তাঁর লেখনী এগুলোর কোনো পূর্বাভাস বহন করে না। এর কেবল একটিই ব্যাখ্যা হতে পারে, এবং যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ছলচাতুরির আড়াল সরিয়ে আমি সেটা অকপটে জোর গলায় বলতে চাই : **ওই তিন উপন্যাস মইদুল ইসলামের লেখা নয়!!!!**

আমি জানি, আমার বক্তব্য অত্যন্ত কর্কশ শোনাবে, অনেকের কাছে এটা খুবই রুচিহীন মনে হবে, তবে এ কথা বলার মধ্য দিয়ে আমি বাংলা সাহিত্যে নতুন কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছি না। কোনো সাহিত্যিক কেলেঙ্কারির অনুপ্রবেশ ঘটানো আমার অভিপ্রায় নয়। আমি কেবল সেই কথাটিই স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছি, যেটি গত এক দশক ধরে তাঁর সীমিত অথচ নিষ্ঠ ভক্তদের মনে অবিরত গুঞ্জরিত হচ্ছে।

আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে আমি মইদুল ইসলামের সাহিত্যকর্মকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে তুলনা টানব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার স্বর্গত বন্ধু আবুল খায়ের সে কাজটি সুচারুভাবে করে গেছেন। আমি বরং মইদুল ইসলামের ব্যক্তিজীবনের কয়েকটি তথ্যের দিকে সবাইকে দৃষ্টি দিতে বলব। এই সব তথ্যের উৎস পরোক্ষ হলেও এগুলোর অথেনটিসিটির ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ।

পশ্চিমের কাল্ট মুভির ধারণা ধার করে মইদুল ইসলামকে 'কাল্ট লেখক' হিসেবে অভিহিত করেছেন মরমি কবি সুকুমার রায় (ছড়াকার সুকুমার রায় নন, ইনি বিক্রমপুর সরকারি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক)। আমার ধারণা, তাঁর এ অভিধা সীমিত আকারে হলেও গ্রহণ করা যায়। এটা ঠিক যে, মইদুল ইসলামের লেখার ভক্ত পাঠককুল সংখ্যায় খুব সীমিত ছিল, তবে এরা তাঁর প্রতি ছিল মোহমুগ্ধ, রিলিজিয়াস কাল্টের মতো তাঁর ভক্ত পাঠকেরা নিজেদের মধ্যে একপ্রকার যোগাযোগ রক্ষা করত, একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব বোধ করত এবং তাঁর লেখা নিয়ে তারা নিয়মিত আনুষ্ঠানিক আড্ডার আসর বসাত। এ রকম দুয়েকটি আসরে যোগদানের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল এবং সেগুলোর একটিতে আমি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের অবতার হিসেবে অভিহিত হতে দেখেছি। পাঠককুলের কাছ থেকে এ রকম একনিষ্ঠ ভক্তিভজনা উপভোগের ক্ষেত্রে মইদুল ইসলামকে অনায়াসে কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তবে কমলকুমারের মতো তাঁর গদ্য দুর্বোধ্য, দুর্গম ছিল না। তিনি বরং কিছুটা লিরিক্যাল গদ্য লিখতেন। অপরাপর কাল্ট লেখকের মতো তিনি বিরলপ্রজও ছিলেন না। মইদুল ইসলাম নিয়মিত লিখতেন এবং দু কি তিনটি নির্দিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা থেকে তাঁর বই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হতো। লেখার রহস্যময়তার কারণে অনেকে তাঁকে কাফকার সঙ্গে তুলনা করতেন, তবে আমার মনে হয় লেখনভঙ্গি আর বিষয়বস্তুর দিক থেকে মার্কিন লেখক ডোনাল্ড বার্থলমের সঙ্গেই তাঁর বেশি মিল পাওয়া যাবে। একাধিক সূত্রে আমি শুনেছি, আমেরিকান লেখকদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। তাঁর লেখার টেবিলের একপাশের দেয়ালে ফিলিপ রথের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবি অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে ঝোলানো পাওয়া গেছে বলে মির্জা একরামুল বাশারের বইয়ে উল্লেখ দেখেছি।

মইদুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের দিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিতে গিয়ে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার একটি বিষয় লক্ষ্য করতে প্রায় সকলেই ভুলে যান কিংবা আমার ধারণা বিষয়টি সজ্ঞানে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আর সেটি হলো, শেষ জীবনে মইদুল ইসলামের গুরুতর অসুস্থতা। বিষয়টিকে আমি মামুলি বলে উড়িয়ে দিতে চাই না। কেননা, মইদুল ইসলামের অসুখটি জটিল ছিল, একটি বিরল প্রাণঘাতী রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এটা লক্ষ না করার কোনো কারণ নেই যে, আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যে তিন উপন্যাস, তার সব কটিই অসুস্থাবস্থায় লেখা। এগুলো লেখার সময় তিনি শুধু যে শয্যাশায়ী ছিলেন, তা-ই নয়, প্রায় সব অর্থে তিনি ছিলেন 'অথর্ব'।

পরিবারের দিক থেকে যত গোপনীয়তা অনুসরণের চেষ্টাই করা হোক না কেন, এ কথা এখন আর কারও অজানা নয় যে, ৪২ বছর বয়সে মইদুল ইসলাম অ্যামাইয়োট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস বা সংক্ষেপে এএলএস নামে বিরল এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এটি অত্যন্ত ভয়াবহ ধরনের নিউরো-ডিজেনারেটিভ অসুখ। তবে কোনোভাবেই এটি বংশগত নয়। এ রোগের পরিণতিতে মইদুল ইসলামের স্নায়ুতন্ত্রের মোটর নিউরোন কোষ শুকিয়ে যেতে থাকে। তাঁর দেহের সকল পেশী একে একে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। রোগ শনাক্ত হওয়ার তিন মাসের মাথায় মইদুল ইসলাম লক্ষ করেন, তিনি তাঁর দেহের কোনো অঙ্গই আর নাড়াতে পারছেন না। তাঁকে স্থায়ীভাবে শয্যা নিতে হয়। তাঁর বাক্‌শক্তি পুরোপুরি লোপ পায়। বিছানায় অনড়ভাবে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা ছাড়া তাঁর আর কিছু করার ছিল না। আর সকলে জানতেন যে, সেই মৃত্যু খুব দূরাগত নয়। কেননা এ রোগ শনাক্ত হওয়ার পর রোগীর খুব বেশি দিন বাঁচার ইতিহাস নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথা মনে করার যথেষ্ঠ কারণ আছে যে মইদুল ইসলাম যখন পুরোপুরি অথর্ব অবস্থায় স্থায়ীভাবে শয্যা নেন, সে মুহূর্তে তিনি তার ত্রয়োদশ উপন্যাস *ফেরারির* সপ্তদশ অধ্যায় লিখছিলেন, যেটি (আমরা এখন জানি) ওই উপন্যাসের পেনাল্টিমেট চ্যাপ্টার। এই অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে মইদুল ইসলামের শেষ অবদান হওয়ার কথা ছিল এবং এখানেই তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের ইতি ঘটার কথা। কিন্তু তা হয়নি। *ফেরারি* উপন্যাসটি শুধু যে সমাপ্ত হয়ে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে, তা-ই নয়, এর পর আরও পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন মইদুল ইসলাম, বলাই বাহুল্য সব কটি ও রকম অথর্ব অবস্থায়।

এই বিস্ময়কর ঘটনার পেছনের মানুষটির নাম প্রণবেশ মাইতি। ইনি মইদুল ইসলামের লেখার জেহাদি ভক্তদের একজন। আশির দশকে ঢাকায় মইদুল ইসলামের ভক্তদের যে কটি পাঠচক্র গড়ে ওঠে, ইনি তাঁর একটির উৎসাহী সংগঠক ছিলেন। অত্যন্ত উদ্যমী ধরনের এ মানুষটি পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য পশ্চিমে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তবে প্রবাসে থেকেও তিনি প্রিয় লেখকের লেখনীর নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন এবং শোনা যায়, যে-গুটিকয় ভক্ত মইদুল ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, প্রণবেশ তাঁদের অন্যতম।

মইদুল ইসলামের এএলএস রোগ ধরা পড়া এবং তাঁর শয্যা নেওয়ার সময় 'পোসাম' নামে একটি ব্রিটিশ কোম্পানিতে চাকরি করতেন প্রণবেশ। কেমব্রিজ-ভিত্তিক এই কোম্পানিটি ইলেকট্রনিক অ্যাসিসটিভ টেকনোলজি বা ইএটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধীদের জন্য নানা রকম যন্ত্র তৈরি করে থাকে। এই সব যন্ত্র বাইরের জগতের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এখানে স্মরণ করিয়ে দিই, এই পোসাম কোম্পানির গবেষক ডেভিড ম্যাসন একদা এএলএস রোগে আক্রান্ত স্টিফেন হকিংকে একটি ইলেকট্রনিক ভয়েস সিনথাসাইজার বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেটি হকিং বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহারও করেছিলেন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিনথাসাইজারের শ্লেষ্মাজড়ানো, ভৌতিক কণ্ঠস্বরকেই আমরা হকিংয়ের মহাজাগতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে চিনি। পোসাম কোম্পানির ল্যাবরেটরিতে ডেভিড ম্যাসনের অধীনে কাজ করতেন প্রণবেশ। এক আইরিশ বিধবার সঙ্গে যেদিন তিনি বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন, সেদিন বিয়ের আসরেই টেলিফোনে তিনি প্রিয় লেখকের রোগের সংবাদ পান। বিবাহ মুহূর্তের রোমান্টিক পরিবেশের কারণে সে সময় সম্ভবত বেশ কিছুটা আবেগপ্রবণ ছিলেন প্রণবেশ। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসেন, মইদুল ইসলামের লেখনীর অকালমৃত্যু প্রতিরোধে তিনি তাঁর সকল শক্তি ও মেধা ব্যয় করবেন।

আমি মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেকখানি সরে এসেছি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমার বক্তব্য অনুধাবনে এইসব অনুপুঙ্খ তথ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আশা করি পাঠক মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনবেন।

প্রণবেশ প্রথমটায় মইদুল ইসলামের জন্য একটি রেগুলার ভয়েস সিনথাসাইজার বানিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগ তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। কেননা এই যন্ত্র ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারীকে শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গ (হাত বা পায়ের অন্তত একটি আঙুল) নাড়াতে সক্ষম হতে হবে। মইদুল ইসলামের সেই সক্ষমতাও ছিল না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। বাকশক্তি হারানোর অল্প কিছুদিনের মধ্যে দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়েছিল তাঁর। কেউ যেন সুসজ্জিত একটি ঘরের দরজা-জানালা এক এক করে বন্ধ করে দিচ্ছে। তবে তাঁর সব জানালা বন্ধ হয়ে যায়নি। মইদুল ইসলামের শ্রবণশক্তি শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল, যদিও সেটা জানা গিয়েছিল আরও পরে। সেই মুহূর্তে কেবল এটিই স্পষ্ট করে জানা গিয়েছিল যে কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে মধ্যবয়সী এই লেখকের মস্তিষ্কটি সম্পূর্ণ অনাহত আছে। তিনি স্বাভাবিক উপায়ে সবকিছু চিন্তা করতে পারছেন, এবং তাঁর স্মৃতিও অটুট আছে। প্রণবেশ এই তথ্যটি পেয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ থেকে ১১ বছর আগে প্রণবেশ মাইতি এক সংক্ষিপ্ত সফরে দেশে আসেন। সেটা শ্রাবণ মাস ছিল। অঝর বৃষ্টিতে ঢাকার অধিকাংশ রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। শাহজাহানপুর রেলগেটের এক কোনায় গাড়ি রেখে এক সহযোগী যুবককে সঙ্গে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটু পানি ডিঙিয়ে প্রণবেশ এসেছিলেন মইদুল ইসলামের বাসায়। দুজনের হাতে প্যাকেটবদ্ধ ভারি কিছু যন্ত্রপাতি। তাঁদেরকে লেখকের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চারটি প্যাকেট খুলে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জোড়া লাগিয়ে তাঁরা যে যন্ত্রটি দাঁড় করান, সেটি দেখতে একটি আইবিএম ডেস্কটপ কম্পিউটারের মতো।

শুনেছি এই পুরো সময়টা একজন বেতনভূক পেশাদারের নিবিষ্ট উদাসীনতায় কাজ করে গেছেন প্রণবেশ মাইতি। পাশেই শয্যায় শায়িত খাকিরঙা একটি সিল্কের শাল দিয়ে শরীর ঢাকা প্রিয় লেখকের দিকে তিনি একবার তাকিয়েও দেখেননি। তাঁর পাশে দুবার কফি রাখা হয়েছিল, তিনি স্পর্শ করেননি। অচল রোগীকে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেওয়ার জন্য পাড়াতো ডিসপেনসারি থেকে ডেকে আনা একজন ভাড়াটে মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্টের মতো নির্লিপ্তি ছিল তার কর্মকাণ্ডে।

যন্ত্রটি দাঁড় করিয়ে ঘরের এক কোনায় রাখা একটি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন পরিশ্রান্ত প্রণবেশ, তারপর জোরে নিশ্বাস ছেড়ে একটি অচেনা বিদেশি সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সম্ভবত ভেতরে ভেতরে তিনি কিছুটা উত্তেজিত থেকে থাকবেন। ঘরে আরও দুয়েকজন বয়স্ক লোকের উপস্থিতি ছিল। সকলের সামনে এভাবে সিগারেট ধরানো যে এ দেশে স্বাভাবিক রীতি-রেওয়াজের মধ্যে পড়ে না, সেটা তাঁর না জানার কথা নয়। সিগারেট টানতে টানতে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন তিনি। প্রিয় লেখকের দিকে নয়, নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে ছিলেন সেগুন কাঠের একটি তেপায়া টেবিলের ওপর রাখা সদ্য বানানো যন্ত্রটির টিকে। তারপর ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজিতে বলে উঠেছিলেন, 'নাউ হি ক্যান রাইট'।

এভাবে মইদুল ইসলামের 'মূল্যবান' লেখনীকে আরও কিছুদিন টিকিয়ে রাখার একটি বন্দোবস্ত হয়েছিল। আর সেটা হয়েছিল তাঁর ভক্ত পাঠক প্রণবেশ মাইতির বানিয়ে দেওয়া যন্ত্রটির কল্যাণে।

যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করত, কীভাবে সেটা অথর্ব একজন লেখককে তাঁর জড়জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিল, সেটার বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বিজ্ঞানের লোক নই। আমি কেবল এটির বহিরঙ্গের কিছুটা পরিচয় দেব।

মইদুল ইসলামের শয্যর পাশে একটি টেবিলে রাখা ছিল যন্ত্রটি : একটি এলসিডি মনিটর আর কালো প্লাস্টিকের কেসিংয়ে ভরা সিপিইউ সংবলিত যন্ত্রটিকে মামুলি ডেস্কটপ কম্পিউটার বলে মনে না করার কোনো কারণ ছিল না। তবে বলাই বাহুল্য, এটি সামান্য কোনো কম্পিউটার যন্ত্র ছিল না। এর সিপিইউর পেছন দিক থেকে বের হয়ে এসেছে চারটি ক্যাথোড টিউব, যেগুলোর অপর প্রান্ত আঠা দিয়ে লাগানো ছিল মইদুল ইসলামের মাথার সঙ্গে। দুটি টিউব লাগানো ছিল লেখকের কপালের দুই টেম্পলে আর দুটি টিউব তাঁর ব্রহ্মতালুর দুপাশে। এখানে বলে রাখি, এই ক্যাথোড টিউব লাগানো উপলক্ষে পূর্বেই মইদুল ইসলামের মস্তিষ্ক মুণ্ডন করা হয়েছিল এবং এ রকম মুণ্ডিত মাথায় তাঁকে ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর মতো দেখাচ্ছিল।

খুব সরলভাবে বললে যন্ত্রটির কাজের প্রকৃতি ছিল এ রকম : এটি মইদুল ইসলামের মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রবাহ 'পড়তে' পারত এবং এই চিন্তাপ্রবাহকে সেটি অজানা একটি ওয়ার্ড প্রসেসর ইন্টারফেসের মাধ্যমে মনিটরে লিখিত আকারে প্রকাশ করত। এভাবে বাক্যের পর বাক্য শুধু 'চিন্তা করে' মইদুল ইসলাম তাঁর স্তব্ধ লেখনীকে আবার সচল করতে পেরেছিলেন। তবে এখানে বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—এ প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিকভাবে সমাধা করা যতটা না কঠিন ছিল, তাঁর চেয়ে কোনো অংশে কম কঠিন ছিল না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসিকভাবে সমাধা করা। কেননা মইদুল ইসলাম আগে সুস্থ অবস্থায় যেভাবে লিখতেন (শুরুতে ফুলস্কেপ কাগজে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে, পরে একটি জার্মান কোম্পানির টাইপরাইটারে ও আরও পরে একটি অ্যাপেল ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারে), তার সঙ্গে এবারের লিখন প্রক্রিয়ার কোনো মিল ছিল না। শব্দ ও বাক্য সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করে একটির পর একটি সাজিয়ে একটি প্লটকে ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ কাজ ছিল না। এই প্রক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্ককে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে নেওয়ার ব্যাপার ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এ কাজটি মইদুল ইসলাম অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর একটা কারণ, মইদুল ইসলাম গোড়া থেকেই গোছানো প্রকৃতির লেখক ছিলেন। একটা পূর্ণ বাক্য মনে মনে সাজিয়ে তারপর সেটি লিখতেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, একেকটি পর্বচ্ছেদ তাঁর মাথায় আগে থেকেই সাজানো হয়ে থাকত। এ কারণে একবার একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে খুব একটা সম্পাদনা করতে দেখা যেত না।

প্রণবেশের যন্ত্রটি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটি ছিল, সেটি হলো চিন্তা ফিল্টার করা। একজন লেখক সারাক্ষণ উপন্যাসের শব্দ আর বাক্য চিন্তা করেন না। প্রতি মুহূর্তে অজস্র চিন্তার স্রোত একটির সঙ্গে আরেকটি জড়িয়ে যেতে থাকে। এর অধিকাংশ শুধু যে অপ্রয়োজনীয় দৈনন্দিনতা, তা-ই নয়, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের অন্ধকার ফ্রয়েডিয়ান কুঠুরিতে এমন বহু চিন্তা অনবরত পাক খেয়ে উঠে আসে, যেগুলোর প্রকাশ তার ও তার পরিপার্শ্বের জন্য ভয়ানক বিব্রতকর হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্যাটির ব্যাপারে প্রণবেশ গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন। আর এ জন্য তিনি তার যন্ত্রে চিন্তা ফিল্টার করার একটি বাড়তি ফাংশন রেখেছিলেন। কোন চিন্তাটি বা একটি চিন্তার কোন অংশটি চূড়ান্তভাবে মনিটরে প্রকাশ পাবে, তা নিয়ন্ত্রিত হতো এই ফিল্টারের মাধ্যমে আর এটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল লেখক মইদুল ইসলামের হাতে। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, শুরুতে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিল্টারের নিয়ন্ত্রণ মইদুল ইসলাম পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেননি, যার পরিণতিতে এক অসতর্ক মুহূর্তে পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ অল্পবয়সী আত্মীয়াকে ঘিরে মইদুল ইসলামের এমন সব চিন্তা মনিটরের পর্দায় প্রকাশ হয়ে পড়ে, যেটি তাঁদের পরিবারকে বেশ কিছুদিন আলোড়িত করে রেখেছিল।

যন্ত্রটি মইদুল ইসলামের মস্তিষ্কের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পর প্রণবেশ আরও তিন দফা এসে সামান্য কিছু সংস্কার করে দিয়ে যান। এ উপলক্ষে সপ্তাহখানেক তিনি দেশে অবস্থান করেন এবং তারপর তাঁর কর্মস্থল কেমব্রিজে ফিরে যান। এর দুদিন আগে থেকে কম্পিউটারের মনিটরে মইদুল ইসলামের নতুন উপন্যাস লেখা হতে থাকে। প্রথমটায় এই লেখার গতি অনেক ধীর ছিল। সম্ভবত নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে মইদুল ইসলামকে বেগ পেতে হচ্ছিল। দিনের বড় একটা সময়জুড়ে কম্পিউটারের পর্দা অনড় থাকত। এ সময় মইদুল ইসলাম ঘুমাচ্ছেন নাকি চিন্তা করছেন, বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তাঁর চোখের পাতা চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো মুদিত থাকত। বিকেলের দিকে তিনি সামান্য কিছু লিখতেন। একটানা ছয়-সাতটি বাক্যের বেশি এগুতো না লেখা। কখনো কখনো একটি বাক্যের মাঝামাঝি এসে তিনি থেমে যেতেন। হয়তো তাঁর মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়ে পড়ত, অথবা লেখক হয়তো সে সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো চিন্তায় ডুবে যেতেন। হতে পারে, আসন্ন মৃত্যু ভাবনায় তাঁর চিন্তার স্রোত মাঝে মাঝেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। এভাবে তিন সাড়ে তিন মাসে তৈরি হয় তাঁর নতুন উপন্যাস *ভেলভেট*-এর পাণ্ডুলিপি।

এটা খুব অবাক হওয়ার মতো একটা বিষয় যে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতিতে, অত্যন্ত অপরিচিত-অনভ্যস্ত এক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে লেখা সত্ত্বেও মইদুল ইসলাম তাঁর লেখনীর শুদ্ধতা পুরোপুরি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এই সব 'বাইরের বিষয়' তাঁর লেখার শৈলী ও বিষয়বস্তুর ওপর কোনো প্রভাবই রাখতে পারেনি। তাঁর সুস্থাবস্থার লেখনীর সঙ্গে এ নতুন লেখাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোভাবে আলাদা করার জো ছিল না। এটি হয়তো তাঁর লেখকসত্তার শক্তিমত্তা আর দৃঢ়তারই পরিচয় বহন করে।

এটা খুব লক্ষ্যণীয় যে ১৮৬ পৃষ্ঠার উপন্যাস *ভেলভেট* প্রকাশ হলে তাঁর পাঠক সমাজের মধ্যে এটি পূর্বের মতো একই মাত্রায় সীমিত সাড়া ফেলে।

ভেলভেট-এর পর কিছুদিন বিরতি দিয়ে মইদুল ইসলাম তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস *ফেরারী*র অষ্টাদশ ও শেষ অধ্যায় লিখে ফেলেন। এরপর তিনি লেখেন *মাতুলালয়* নামে এক জটিল রাজনৈতিক উপন্যাস। দীর্ঘ, সুপরিসর এ উপন্যাসে বেশ কিছু আত্মজৈবনিক উপাদান আছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

এরপর কম্পিউটারের পর্দা আমাদের একে একে উপহার দেয় *গিরগিটি*, *বেহুলার বাসর* ও *তারাশঙ্করের ডায়েরি*—মইদুল ইসলামের শেষ এবং বিতর্কিত তিন উপন্যাস। এগুলো সম্পর্কে শুরুতেই কিছু কথা বলেছি। এ স্থলে আরও কিছু কথা যোগ করতে চাই।

প্রথম দুটি উপন্যাস *গিরগিটি* ও *বেহুলার বাসর* বের হওয়ার পরপরই আবুল খায়ের নামে এক বিদগ্ধ পাঠক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, এগুলো মইদুল ইসলামের লেখা নয়। মইদুল ইসলামের বাক্যের গঠন, তাঁর ক্রিয়াপদের ব্যবহার, উপমা প্রয়োগের প্রবণতা ইত্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আবুল খায়ের ওই নিবন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেন। তবে আবুল খায়ের এটি কোথাও ছাপতে দেননি। এটি প্রকাশিত হলে সেটা যে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কেলেঙ্কারির উপলক্ষ তৈরি করত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আবুল খায়ের ছিলেন মইদুল ইসলামের সেই ঘনিষ্ঠ ভক্ত চক্রের অংশ, যে চক্রটি তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভ করার সুযোগ পেত। প্রিয় লেখককে ঘিরে অযথা কোনো বিতর্কের জন্ম দেওয়া আবুল খায়েরের অভিপ্রায় ছিল না। তাই প্রথমটায় তিনি তাঁর নিজস্ব গণ্ডির ভেতরে আপত্তি তুলতে শুরু করেন। শিগগিরই বিষয়টা মইদুল ইসলামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরের সার্কেলের (পরিবার, প্রকাশক এবং তাঁর অ্যাসিসট্যান্ট-কাম-লিটারারি এজেন্ট) কানে যায় এবং এক আসন্ন কেলেঙ্কারির আশঙ্কায় তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা আবুল খায়েরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টা স্থায়ীভাবে ফয়সালা করার প্রস্তাব দেন। তত দিনে মইদুল ইসলামের শ্রবণশক্তি অটুট থাকার তথ্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ জানা গেছে, বাইরের জগতের সঙ্গে একেবারেই যোগাযোগহীন তিনি নন। কিছুটা পরোক্ষ হলেও তাঁর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনে যাওয়া সম্ভব। ফলে সাব্যস্ত হয়, মইদুল ইসলামের কাছ থেকেই এই সন্দেহের জবাব চাওয়া হবে।

এই অভিপ্রায়ে এক ঘোর বৃষ্টির দিনে মইদুল ইসলামের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ায় পাঁচটি প্রাণি—আবুল খায়ের, মইদুল ইসলামের প্রকাশক, তাঁর অ্যাসিসট্যান্ট এবং পরিবারের দুই বুজুর্গ সদস্য, যাদের একজন মির্জা একরামুল বাশার (ইনিই পরবর্তীকালে মইদুল ইসলামকে নিয়ে একটি স্মৃতিকথা লিখবেন এবং সেটায় এই বিশেষ দিনটির প্রসঙ্গ পুরোপুরি চেপে যাওয়া হবে)। তাঁদের একজন, আমি জানি না কোনজন, কিছুক্ষণ গলা খাঁকারি দিয়ে মইদুল ইসলামের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, শেষ দুটি উপন্যাস তিনি লেখেননি বলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই দুই উপন্যাস আসলেই তাঁর লেখা কি না? শুনেছি, মইদুল ইসলাম এই প্রশ্নে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, সকলকে তিরস্কার করে তিনি ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এমন মৌন তিরস্কারের উদাহরণ আর আছে কি না সন্দেহ—তাঁর স্নিগ্ধ ঘুমজড়ানো মুখমণ্ডলে এর কোনো ছাপ পড়েনি।

এই ঘটনার কিছুদিন পর *তারাশঙ্করের ডায়েরি* প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পটভূমিতে রচিত এ ডিটেকটিভ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি হওয়ার পরপরই মইদুল ইসলামের শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটে। তিনি আর বেশি দিন বাঁচেননি।

আবুল খায়ের আর কখনোই তাঁর আপত্তির কথা মুখ ফুটে উচ্চারণ করেননি। তবে তাঁর সন্দেহ থেকে তিনি মোটেও বিচ্যুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হননি। বরং *তারাশঙ্করের ডায়েরি* পড়ে তাঁর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

এই ঘটনার বছর পাঁচেক পর আবুল খায়েরের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। মইদুল ইসলামের কথাসাহিত্য আমাদের মধ্যে হৃদ্যতার সেতু তৈরি করে থাকবে। আবুল খায়ের তাঁর পুরোনো নিবন্ধটি আমাকে পড়তে দেন। মইদুল ইসলাম ও প্রণবেশ-সংক্রান্ত যেসব অনুপুঙ্খ বিবরণ এখানে আমি দিয়েছি, সেগুলো আবুল খায়েরের মুখ থেকে শোনা।

কোলন ক্যান্সারে আবুল খায়েরের মৃত্যুর পর তাঁর সিদ্ধান্তটি আমি বহুদিন ধরে বহুভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবেছি। যতই দিন গেছে, ততই তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে বাধ্য হয়েছি।

মইদুল ইসলামের নামে ছাপা হওয়া শেষ তিনটি উপন্যাস যে তাঁর লেখা নয়, এ বিষয়ে কনভিন্সড হতে আবুল খায়েরের নিবন্ধটিই যথেষ্ট। আমি এটি আমার লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলাম।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলে শেষ করব।

ওই তিন উপন্যাস যদি মইদুল ইসলামের না হয়ে থাকে, তবে সেগুলো কার লেখা?

এর কোনো উত্তর আমার জানা নেই। একবার সন্দেহটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জায়গা করে দিলে অনেকে এটির ওপর আলো ফেলতে পারবেন। তখন অনেকের আলোচনার ভেতর থেকে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়তো বেরিয়ে আসবে।

এখানে আমি কেবল কয়েকটি সন্দেহের কথা বলতে পারি।

আবুল খায়ের নিজে মনে করতেন, এ তিন উপন্যাস আসলে প্রণবেশ মাইতির লেখা। প্রণবেশ তাঁর যন্ত্রটিকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন, যাতে তাঁর নিজের লেখাগুলো মইদুল ইসলামের লেখা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এ কাজ করার পেছনে প্রণবেশের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, সেটার কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা আবুল খায়ের আমাকে দিতে পারেননি। হতে পারে, সাহিত্যিক উচ্চাভিলাস ছিল তাঁর। কিন্তু নিজের লেখার ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তাঁর লেখাগুলোর প্রকৃত মূল্য যাচাই করার একটি কৌশল নিয়েছিলেন তিনি। আবুল খায়ের তাঁর এ অনুমানের পক্ষে একটিই পরোক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পেরেছিলেন। প্রথম জীবনে প্রণবেশ যখন লেখালেখিতে হাত পাকানোর চেষ্টা করছেন, সে সময়কার একটি গল্পের খসড়ায় ললিতা নামে একটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। মইদুল ইসলামের *বেহুলার বাসর* উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটির নামও ললিতা। এটা এত সূক্ষ্ম একটা মিল যে দৈব ছাড়া আর কিছু বলে চালানোর উপায় নেই।

আমার নিজের অনুমান আরেকটু বিচিত্র। আমি মনে করি, প্রণবেশ মাইতির বানানো ওই যন্ত্রটিই আসলে শেষ তিন উপন্যাসের লেখক। হতে পারে, মইদুল ইসলামের প্রথম দুটি উপন্যাস এবং একটি উপন্যাসের শেষ অধ্যায় লিখে দেওয়ার সময় সেই যন্ত্রটি ফিকশন লেখার কলাকৌশল রপ্ত করে নিয়েছিল। তারপর শুরু করেছিল নিজে থেকে লিখতে।

সন্দেহ নেই এটি একটি উন্মাদ অনুমান। এটি সত্য হতে হলে নিজে থেকে চিন্তা করতে পারে—এ রকম একটি যন্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করতে হবে আমাদের। বিজ্ঞানের লোক না হয়েও আমি জানি, এ রকম একটি ব্যাপারকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে ডাকা হয় এবং সে রকম কিছু আদৌ তৈরি করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে বিজ্ঞানের রাজ্যে এখনো তর্ক শেষ হয়নি। বিশেষ করে প্রণবেশ মাইতির মতো কারও পক্ষে এ রকম একটি যন্ত্র বানানো যে সম্ভব ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এটা তো ঠিক যে, মইদুল ইসলামের চিন্তা প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল যন্ত্রটি, এবং কোনো এক দুর্বোধ্য উপায়ে হয়তো এটি নিজেকে বিবর্তিত করে নিয়েছিল, সেই বিবর্তন জৈব বিবর্তনের নিয়ম মেনে হয়নি, হয়তো যন্ত্রের বিবর্তনের আলাদা কোনো কলাকৌশল থেকে থাকবে, অন্য কোনো ডারউইন যেটা একদিন আবিষ্কার করবেন। গোড়াতে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ছিল না যন্ত্রটির,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মইদুল ইসলামের মস্তিষ্কের সঙ্গে এটির মিথস্ক্রিয়ায় কোথাও তৃতীয় একটি মিথজীবী বুদ্ধিমত্তা তৈরি হয়ে গিয়ে থাকবে, মইদুল ইসলামের মস্তিষ্ক ছাড়া যেটির স্বাধীন সত্তা ছিল না এবং মইদুল ইসলামের মস্তিষ্কটি এটির পোষক দেহ হিসেবে কাজ করছিল, তাঁর অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির ভান্ডার হয়ে উঠেছিল এটির খাদ্য। এ কারণে মইদুল ইসলামের মস্তিষ্কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যবর্তী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটির অস্তিত্বও বিলীন হয়ে গেছে।

আমার অনুমানের ওপর কিছুটা আলো ফেলতে পারতেন প্রণবেশ মাইতি। কিন্তু আমরা গত নয় বছরে তাঁর কোনো খোঁজ পাইনি। শুনেছি, আইরিশ স্ত্রীর অবিশ্বস্ত আচরণ তাঁকে দিনে দিনে উন্মাদপ্রায় করে তুলেছিল এবং নিজ বিছানায় স্ত্রীর তরুণ প্রেমিককে হত্যা করে তিনি স্থায়ীভাবে গা ঢাকা দিয়েছেন।

আমি মনে করি না, শেষ তিনটি উপন্যাসকে তাঁর রচনাবলি থেকে সরিয়ে ফেললে বাংলা সাহিত্যে মইদুল ইসলামের এত দিনকার আসনের খুব একটা ব্যত্যয় ঘটবে। ওই তিন উপন্যাস ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু এখন তাঁর অন্য উপন্যাসগুলোকেও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা শুরু হয়ে গেছে এবং মইদুল ইসলাম তাঁর কাল্ট খ্যাতির সীমা ডিঙিয়ে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর সমাদর পেতে শুরু করেছেন। আমার প্রস্তাব, তাঁর রচনাবলির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় একটি বাড়তি খণ্ড প্রকাশ করা হোক, যেখানে এই তিন উপন্যাসকে জায়গা দেওয়া হবে এবং সেখানে মইদুল ইসলামকে এই উপন্যাসগুলোর সহ-লেখক হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হবে। অপর সহ-লেখকের ঘরটি ফাঁকা রাখা হোক, তত দিন পর্যন্ত, যত দিন না মানব সমাজ এই মধ্যবর্তী সত্তাটির যথাযথ একটি নাম খুঁজে পাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~